শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ ও বৈষ্ণবতত্ত্ব

ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

শঙ্কর প্রকাশন ॥ ১৫-১এ, যুগল কিশোর দাস লেন ॥ কলকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ : রাসপূর্ণিমা ১৩৫২

প্রকাশক :
নিতাই মজুমদার
শঙ্কর প্রকাশন
১৫/১এ, যুগল কিশোর দাস লেন,
কলকাতা-৬

মুদ্রক :
গৌর মজুমদার
শঙ্কর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৬১, বিবেকানন্দ রোড,
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ : ইন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
প্রেস এণ্ড প্রসেস্ ষ্টুডিও
কলকাতা-৯

প্রাতঃস্মরণীয় জননায়ক

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের

জ্যেষ্ঠ জামাতা

স্বর্গত

সুধীর রায় বার-এ্যাট-ল

এবং

জ্যেষ্ঠা কন্যা

স্বর্গগতা

অপর্ণা দেবীর

পুণ্যস্মৃতির

উদ্দেশে

ভূমিকা

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শারদীয়া সংখ্যা ও মাসিক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত কয়েকটি নিবন্ধ লইয়া এই "শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ ও বৈষ্ণবতত্ত্ব" গ্রন্থখানি সংকলিত হইল। প্রকাশের ভার লইয়াছেন নিতাই মজুমদার। নাট্যশালার ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা সুলেখক শ্রীমান্ শঙ্কর ভট্টাচার্য্য এবং জ্যোতিরত্ন শ্রীমান্ সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের আগ্রহাতিশয্যে গ্রন্থটির প্রকাশ সম্ভবপর হইল। এজন্য ইহাদিগকে আশীর্বাদ জানাইলাম।

গ্রন্থের নাম দিয়াছি শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ ও বৈষ্ণবতত্ত্ব। গ্রন্থে প্রকাশিত প্রতিটি নিবন্ধেই আকারে ইঙ্গিতেই হউক আর স্পষ্ট ভাষাতেই হউক সংক্ষেপে কৃষ্ণকথা ও বৈষ্ণবতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছি। কৃষ্ণকথা বলিতে হইলে গোপীকথা এবং শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দের কথা বলিতেই হইবে। আমিও তাহা বলিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণকথার প্রবক্তা শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, উপদেষ্টা দেবর্ষি নারদ—আমি এই দুইজনকেও স্মরণ করিয়াছি।

আচার্য্যগণ বলেন, শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণখানি ব্রহ্মসূত্রের অর্থ এবং গায়ত্রীর ভাষ্য। এইজন্য সংক্ষেপে গায়ত্রীর কথাও আলোচনা করিয়াছি। এই সঙ্গে বৈষ্ণবীয় দীক্ষার কথাও বলিতে হইয়াছে।

শ্রীভগবানের নামগুণ ও লীলা লইয়া কীর্ত্তনের দুইটি ধারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। একটি নামকীর্ত্তন অন্যটি লীলাকীর্ত্তন। লীলাকীর্ত্তনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আচার্য্য ছিলেন শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়। ঠাকুর মহাশয় যাহার নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন আমি এই গ্রন্থে সেই নাদসিদ্ধ আচার্য্য শ্রীহরিদাস স্বামীকেও স্মরণ করিয়াছি।

আমি অত্যন্ত অসুস্থ, সেই জন্যই গ্রন্থ মুদ্রণের তত্ত্বাবধান করিতে পারি নাই। যদিও ছাপার হরফে প্রকাশিত নিবন্ধ সমূহ দেখিয়াই গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়াছে তথাপি দুর্ভাগ্যবশত প্রুফ দেখিবার দোষে গ্রন্থটির মধ্যে অজস্র ছাপার ভুল থাকিয়া গিয়াছে। আমি যথাসাধ্য যত্ন লইয়া একটি শুদ্ধিপত্র সংযুক্ত করিয়া দিলাম। পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক শুদ্ধিপত্রটি দেখিয়া লইবেন।

আমি অত্যন্ত দুর্দিনে শ্রীযুক্ত সুধীর রায় এবং শ্রীমতী অপর্ণা দেবীর শ্রদ্ধা ও স্নেহ লাভে ধন্য হইয়াছিলাম। সেই দুর্দিনে তাঁহাদের অর্থানুকূল্যেও আমার বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছিল।

সেই দিনের কথা স্মরণ করিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি তাঁহাদের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করিলাম। বাংলার কীর্ত্তন ও কীর্ত্তনীয়া গ্রন্থে আমি সুধীর রায় ও অপর্ণা দেবী প্রতিষ্ঠিত ব্রজমাধুরী সংঘের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। গ্রন্থখানি পাঠক সমাজে সমাদৃত হইলে কৃতার্থ হইব।

ইতি—
বিনীত
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

অধিষ্ঠান ভূমি

শ্রীধাম নবদ্বীপ দেখিব, ধামের পরিচয় জানিব। কেমন উপায়ে দেখিব, নবদ্বীপে গিয়া একখানা হাওয়া-গাড়ী লইয়া ভাল ভাল রাস্তায় ঘুরিয়া দেখিব। কিম্বা পায়ে হাঁটিয়া প্রতিটি গলি ঘুঁচি দেখিয়া বেড়াইব। ভূগোল পড়িয়া জানিব, না কোন নবদ্বীপ-ফেরৎ জানা-শোনা লোকের মুখে শুনিব। দেখিবার জানিবার রকমফের আছে, নানা রকমের ভঙ্গ আছে। যাহার যেমন বুদ্ধি, জ্ঞান, হৃদয়, আগ্রহ, কৌতূহল, সামর্থ্য,—ইহা হইতেই আবার অধিকার-ভেদের কথা আসিয়া পড়ে। কিন্তু আমি এখানে কথাটা তুলিয়াছি—দেখিবার স্থিতি স্থান লইয়া। ইহারই নাম দিয়াছি অধিষ্ঠানভূমি। শাস্ত্রসমূহ একটা অধিষ্ঠানভূমি নির্দিষ্ট করিয়া দেন, তোমাকে সেইখানে দাঁড়াইয়াই দেখিতে হইবে। তাঁহাদের নির্দিষ্ট ভঙ্গিতেই দেখিতে হইবে। তবে ঋষিগণের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা দাঁড়াইয়া থাকেন ঠিক জায়গায়, কিন্তু দেখেন নিজের নিজের সাধনার দৃষ্টিতে। যাঁহার যেমন অনুভব, দৃষ্টিও তেমনই। অবশ্য ইহার জন্য তাঁহাদের সাধনা অসাধারণ। আমি দেখিবার কথা এখানে না বলিয়া দাঁড়াইবার স্থানের কথাটাই বলিব। অধিষ্ঠানভূমির কথাই বলিব। উদাহরণ স্বরূপ কীর্ত্তনের গৌরচন্দ্রিকার কথা বলিতেছি। কীর্ত্তনীয়া গৌরচন্দ্রিকা গাহিয়া তোমাকে গৌরচন্দ্রের পদপ্রান্তে বসাইয়া দিয়া গেলেন। চিন্তা কর প্রেমোদ্দাম কৌপীনসম্বল সন্ন্যাসীকে। স্নেহময়ী স্থবিরা জননী, প্রেমময়ী যুবতী ভার্য্যা, নবদ্বীপবাসী অনুরক্ত স্বজন—সকলকেই যিনি ত্যাগ করিয়া মানব-কল্যাণে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, স্মরণ কর সেই কল্যাণ-মূর্ত্তিকে।

ভারত-বিখ্যাত বৈদান্তিক শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম, বাঙ্গালার ক্ষমতাপন্ন রাজবল্লভ শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, সপ্তগ্রামের ধনকুবেরের সন্তান রঘুনাথ দাস—এই সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণীর, বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষ যাঁহাকে ভগবান বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন, মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ কর—সেই মহাপুরুষকে। এইবার নির্ম্মল অন্তঃকরণে নিবিষ্ট চিত্তে কীর্ত্তন শোন। বুঝিতে পারিবে মর্ত্ত্যের মাটীতে মরণধর্ম্মশীল মানুষের ভাষায় রচিত হইলেও এ গান অমরার আনন্দ-নন্দন হইতে অমৃতের বাণী বহিয়া আনিয়াছে। প্রাকৃত জগতে অপ্রাকৃত জগতের লীলামাধুরী প্রকাশ করিতেছে।

প্রথম উদাহরণ দিব শ্রীমদ্ভাগবদগীতা হইতে। গীতার অধিষ্ঠানভূমি অর্জ্জুনের বিষাদযোগ। ক্ষত্রিয় সন্তান, যাঁহারা তাঁহাদিকে আজীবন অকথনীয় সহনাতীত যাতনা দিয়াছেন, অকল্পনীয় অপমান করিয়াছেন, বসতির জন্ত পাঁচখানি গ্রাম চাহিয়াও যাঁহাদের বিশ্বগ্রাসী লোভ এবং গিরিগৌরবস্পর্দ্ধী উত্তুঙ্গ দম্ভের নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন—সেই শত্রু আজ স্বেচ্ছায় সম্মুখে সমুপস্থিত। এই যুদ্ধের তাঁহারাই উদ্যোক্তা। ক্ষত্রিয়বাঞ্ছিত প্রতিকারোপায় করতলগত। অর্জ্জুন কিন্তু ক্লীবের মত ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিয়া বসিলেন, আমি যুদ্ধ করিব না। উর্ব্বশীর অভিশাপ কি বিরাট বস্তর মুক্তি দিয়া গিয়াছে। আমার মনে হয় সেই ক্লৈব্য কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গন পর্য্যন্ত অনুসরণ করিয়াছিল, ক্ষণেকের জন্তও অর্জ্জুন মোহগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু অর্জ্জুনের সৌভাগ্য—তিনি সারথি পাইয়াছিলেন অখিল প্রাণী-মনোরথের রথীকে, চিরন্তন অন্তর্য্যামীকে, অচেতন পদার্থের অন্তর্নিহিত শাশ্বত সত্তাকে, ত্রিকাল সত্যস্বরূপকে। আমাকে এইখানে দাঁড়াইয়াই সমগ্র গীতা পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। গীতার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। গীতার চরম এবং পরম সত্যশরণাগতি—কায়মনোবাক্যে দৃঢ় নির্ভর, অকপট ভগবৎশরণাগতি। আমাকে এই কথা স্মরণে রাখিয়াই সর্ব্বদ্বন্দ্ব—সর্ব্ব সংশয় পরিহার করতে হইবে। সর্ব্বজন পরিচিত মন্ত্রঃ—'যাহাদের জন্ত শোক করা উচিত নয়, তুমি তাহাদেরই জন্ত শোক করিতেছ। অথচ প্রজ্ঞাবানের মত কথা বলিতেছ!' ইহাই গীতার বীজ। গীতার শক্তি হইল—

"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য
মামেকং শরণং ব্রজ"

সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমারই শরণ গ্রহণ কর। এই শক্তিই গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়কে ধরিয়া রাখিয়াছে। আর গীতা যে কীলকে আবদ্ধ থাকিয়া তাহার চতুষ্পার্শ্বে আবর্ত্তিত হইতেছে—সে মন্ত্র 'অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।' 'আমিই তোমাকে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি শোক করিও না।' আমার কথিত অধিষ্ঠান ভূমিতে দাঁড়াইয়া ভগবানের শরণ গ্রহণ কর। শোন, তোমার অন্তর-কুহরে ধ্বনিত হইতেছে ঐ মহাবাণী—শোক করিও না, আমিই তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত করিব। সমগ্র গীতা শুনিয়া অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন আর আমার মোহ নাই, আমি স্মৃতি লাভ করিয়াছি অর্থাৎ স্ব-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি, প্রকৃতিস্থ হইয়াছি—'করিষ্যে বচনং তব।'

ভগবানের শ্রীমুখের বাণী শুনিলাম। তাঁহার যৌবনসঙ্গী, ভগিনীপতি সমপ্রাণ সখারও কথা শুনিলাম। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রকে যিনি এই বার্ত্তা শুনাইয়াছেন তাঁহার কথাটা শোন—মহারাজ আমি কেশব অর্জ্জুনের এই পুণ্য কথা বারংবার স্মরণ করিয়া মুহুর্মুহু হর্ষাপ্লুত হইতেছি। আর হরির সেই অত্যদ্ভুত বিশ্বরূপ পুনঃ পুনঃ স্মরণপূর্ব্বক বিস্ময়ে ও হর্ষে অভিভূত হইয়া পড়িতেছি। বিশ্বরূপই বিস্মিত করিয়াছিল সঞ্জয়কে। সঞ্জয় শ্রীভগবানের মনোহর দ্বিভুজ রূপও তো দেখিয়াছিলেন। যাহা হউক যুদ্ধটা আরম্ভ হইয়া গেল।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর অধিষ্ঠানভূমিও বিষাদ যোগ। তবে তাহার একটু রূপান্তর আছে। সম্রাট সুরথ ক্ষত্রিয়। দুষ্ট অমাত্যের চক্রান্তে ম্লেচ্ছ আক্রমণে রাজ্য হারাইয়া তিনি গহন বনে পলাইয়া গেলেন। তাহার পর সুরথ যেন একজন সামান্য মানুষ। রাজ্য উদ্ধারের কোন প্রযত্ন নাই, নাই উদ্যম, নাই অধ্যবসায়। মুখে কেবল হায় হায়। হায় আমার ভৃত্যেরা কাহার পরিচর্য্যা করিতেছে, আমার প্রিয় হস্তীটির পৃষ্ঠে কে এখন আরোহণ করিতেছে। কত যত্নে সঞ্চিত পরিপূর্ণ রাজকোষ না জানি কাহার অপব্যয়ে এখন শূন্যতার কোন্ অন্ধকূপে নামিয়াছে। ভাবনার যেন অন্ত নাই। এমন সময় সমাধি নামে এক বৈশ্য আসিয়া উপস্থিত। বৈশ্যের অসাধু স্ত্রী-পুত্রই ধনলোভে তাহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য, বনে আসিয়া বৈশ্য স্ত্রী-পুত্রের কথাই চিন্তা করিতেছে। স্ত্রীর কোন অসুখ করিল কিনা, ছেলেটা কেমন আছে। বৈশ্য এই দুশ্চিন্তাতেই কাতর। হঠাৎ দেখা হইয়া গেল রাজা সুরথের সঙ্গে। দুই জনেই সমব্যথী, একই চিন্তা দুজনেরই মনে। ভাগ্য ভাল যে বনটা ছিল তপোবন। মহর্ষি মেধসের আশ্রম ছিল সেই বনে। সন্ধান পাইয়া তাঁহারা মহর্ষির পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন। উভয়েই মহর্ষিকে আপন আপন পরিচয় দিয়া মনোবেদনার কারণ নিবেদন করিলেন। আরম্ভ হইয়া গেল দুর্গা সপ্তশতী। মহর্ষি মেধস, সুরথ ও সমাধিকে এই মোহের কারণ জানাইলেন। মোহদাত্রী মহামায়ার নামটাও শুনাইলেন। "ভগবন্ কাহি সা দেবী" এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়াই মেধসকে সমগ্র চণ্ডীর বৃত্তান্ত বলিতে হইল। আশ্চর্য্যের কথা, গীতা শুনাইয়াই ভগবান যুদ্ধ সুরু করিয়াছিলেন। মেধস কিন্তু যুদ্ধের বর্ণনার মধ্য দিয়াই আপন বক্তব্যটা বলিলেন। মধুকৈটভ বধ, মহিষাসুর বধ, আর শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ, বিরাট কাণ্ড। আচার্য্যগণ বলিয়াছেন—ইহার নাম ব্রহ্ম-গ্রন্থিভেদ, বিষ্ণুগ্রন্থিভেদ ও রুদ্রগ্রন্থিভেদ। মোটের উপর মহামায়াকে জানিতে হইবে। তিনি মহামোহরূপিণী আবার তিনিই মহামেধাস্বরূপিণী।

আবার তিনিই সৌম্যাসৌম্যতরাশেষাসৌমেভ্যস্তৃতিসুন্দরী। চণ্ডীর অধিষ্ঠান ভূমিতেই আছে, সৎসঙ্গ। প্রাণ খুলিয়া অকপটে ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্যের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। তিনিই তোমার সর্ব্বমোহ অপসারিত করিয়া দিবেন। চণ্ডীতেও বিশ্বরূপ আছে। জগদেকসুন্দরী জননী আমার গোটা রথটাই মুখে পুরিয়া কড়মড় করিয়া চিবাইতেছেন। আস্ত হাতী ঘোড়া ধরিয়া গিলিতেছেন। অর্জ্জুন দিব্য চক্ষে যে বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন, এখানে দৈত্য দানবেরা চর্ম্মচক্ষে তাহাই দেখিতেছে। মেধস চণ্ডীতে দেবীর মায়া, মহামায়া এবং বিষ্ণু মায়া—এই তিন রূপেরই সন্ধান দিয়াছেন। এইবার তুমি বাছিয়া লও।

আর একটি মহাগ্রন্থের অধিষ্ঠানভূমির কথা এবার বলিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিব। গ্রন্থটি মহাপুরাণ—নাম শ্রীমদ্ভাগবত। ভারতের অন্যতম রহস্যগ্রন্থ। ভাগবতের অধিষ্ঠানভূমি এইরূপ। ভারতবর্ষের রাজচক্রবর্ত্তী পরীক্ষিত। পরীক্ষিত যখন মাতৃগর্ভে, সেই সময় দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামা পাণ্ডব-বংশ নির্ব্বংশ করিবার জন্য ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন উত্তরার উপর। উদ্দেশ্য গর্ভস্থ শিশুর প্রাণনাশ। শ্রীভগবান উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করিয়া সে যাত্রা পরীক্ষিতকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাই পরীক্ষিতের অপর নাম বিষ্ণুরাত। কিন্তু শ্রীভগবানও বুঝি নিয়তিকে খণ্ডন করিতে পারেন না। ব্রহ্মাস্ত্র এ যাত্রা ব্যর্থ হইল, কিন্তু অশ্বত্থামার কোপাগ্নিসহ সেই অস্ত্রের অদৃশ্য তেজ পরীক্ষিতকে যেন অনুসরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। মৃগয়াশ্রান্ত পরীক্ষিত এক তপোবনে গিয়া এক ঋষির নিকট উপস্থিত হইলেন, প্রার্থনা করিলেন পানীয়।—ঋষি! আমি তৃষ্ণার্ত্ত, আমাকে জল দানে অতিথি সৎকার করুন। সমাধিস্থ ঋষির কর্ণে পিপাসার্ত্ত রাজার কণ্ঠস্বর প্রবেশ করিল না। পরীক্ষিত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। আমার রাজ্যে অতিথির অবমাননা। তিনি ঋষির গলদেশে এক মৃত সর্প পরাইয়া দিয়া রাজ্যে ফিরিলেন। ঋষিপুত্র পিতার অসম্মানে ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দিলেন, যে এ কাজ করিয়াছে, সপ্তাহ মধ্যেই তক্ষক তাহাকে দংশন করিবে।

এই ঋষির নাম শমীক। শমীকের পুত্রের নাম শৃঙ্গী। শৃঙ্গীর অভিশাপে বেদনাতুর ঋষি শিষ্য গৌরমুখকে পরীক্ষিতের নিকট পাঠাইয়া দেন। পরীক্ষিত গৌরমুখের মুখে শাপবৃত্তান্ত অবগত হইয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উদ্দেশ্য প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ। পাছে আত্মহত্যার পাপ স্পর্শ করে, তাই সন্ধ্যাকালে একবিন্দু গঙ্গাজল পানের সংকল্প গ্রহণ করিলেন।

দুঃসংবাদ দাবানলের মত সারা ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িল। রাজদর্শন মানসে উপস্থিত হইলেন প্রজাবৃন্দ, ভারতের ঋষি তপস্বী, জ্ঞানী গুণী ভক্ত সম্প্রদায়। উপস্থিত হইলেন ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা বেদব্যাস-নন্দন ব্রহ্মর্ষি শ্রীশুকদেব। পরীক্ষিত-প্রশ্নে শ্রীশুকদেব বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন সাত্বতী শ্রুতি শ্রীভাগবত কথা। শ্রোতা নিশ্চিত-মৃত্যু এক রাজ্যেশ্বর। যিনি মৃত্যুর সংবাদ জানিয়া আর পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া চাহেন নাই। পড়িয়া রহিলেন প্রেমময়ী সহধর্ম্মিনী, প্রিয়তম পুত্র, পড়িয়া রহিল স্বর্ণ সিংহাসন—ভারতের অসপত্ন সাম্রাজ্য। আর বক্তা মায়াতীত পুরুষ আকুমার ব্রহ্মচারী সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা শ্রীহরিপ্রেমোন্মত্ত শ্রীশুকদেব। পরীক্ষিতের প্রশ্ন—"যে মরবে, সে করবে কি?" মরণের অবধারিত কাল নাই। সুতরাং চিতার কাঠ শিয়রে রাখিয়া জীবন্মৃত হইয়া থাকিতে চাহে যে, সে তো ক্লীব কাপুরুষ। কিন্তু দৈবক্রমে যে মৃত্যুর দিন জানিয়াছে, তাহার করণীয় কি? আবার মৃত্যুর যেমন অবধারিত কাল নাই, তেমনই কখন সে আসিবে তাহারও স্থিরতা নাই। অথচ সে আসিবেই। সুতরাং অজর অমর ভাবিয়া যেমন বিদ্যা ও অর্থের চিন্তা করিবে, তেমনই মৃত্যু তোমার চুলের মুঠি ধরিয়াই আছে, এই চিন্তায় ধর্ম্মাচরণ করিবে। ভাগবত ইহারই সমন্বয় শাস্ত্র। এই সামঞ্জস্য সাধন—ইহাই ভাগবতের সরলার্থ। ভাগবতে যেমন অমল-আত্মা পরমহংস মুনিগণের পরম আস্বাদ্য বস্তু আছে, তেমনই সমাজের নিম্নতম স্তরের অধিবাসীবৃন্দেরও শ্রোতব্য পরম রসায়ন আছে। ভাগবতে হরিকথা আছে, হরিপরায়ণ লোককল্যাণব্রতী সাধুগণের বৃত্তান্ত আছে, আবার দুষ্কৃতিপরায়ণ অসৎগণেরও বিবরণ আছে। সকল শ্রেণীর নরনারীর শ্রবণমঙ্গল এমন ভরোষা বোধহয় আর দ্বিতীয় নাই। যিনি সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ত্রিলোকের অধীশ্বর পরমেশ্বর, তিনিই যে ভক্তাধীন গোবিন্দ-শ্রীমদ্ভাগবত উচ্চকণ্ঠে এই নিশ্চিত ভরসার বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছেন। ভাগবতে শ্রীভগবান নিজমুখে বলিয়াছেন—আমি ভক্তপরায়ণ। ভক্তি কেমন করিয়া লাভ করা যায় শ্রীমদ্ভাগবত সে পথেরও সন্ধান দিয়াছেন। গীতার আঠারটি সোপান অতিক্রম করিয়া ভাগবতের ভগবদ্ধাম শ্রীধাম বৃন্দাবনে প্রবেশ করিতে হয়, কিন্তু তাহার জন্য কর্ম চাহি না, জ্ঞান চাহি না, চাই নিষ্কিঞ্চনা, ভক্তি। চণ্ডীতে যিনি বিষ্ণুমায়া—ভাগবতের কৃষ্ণলীলায় আদাবন্তে তিনিই অধিনায়িকা। ভাগবতে কর্ম্ম রহস্য আছে, যোগ রহস্য আছে, জ্ঞান রহস্য আছে, সর্ব্বোপরি আছেন ভক্তি মহারাণী। এই ভক্তি প্রেম-ভাব এবং মহাভাবে ঘনীভূতা হইয়া কৃষ্ণের প্রেয়সীশ্রেষ্ঠা রূপে আবির্ভূতা হইয়াছেন ভাগবতে।

তিনি ব্রজসীমন্তিনীগণের মধ্যমণি শ্রীরাধা, এই প্রেমময়ীর প্রেমকণিকাই মাতারূপে, পিতারূপে, পুত্ররূপে, কন্যারূপে, বন্ধুরূপে, জায়ারূপে, জগতকে ধরিয়া রাখিয়াছে। মানুষ সর্ব্বভাবে তাহার শরণ গ্রহণ করিলেই ধন্য হইবে, কৃতকৃতার্থ হইবে; মাতৃগর্ভে পরীক্ষিতকে ব্রহ্মকোপ হইতে, ব্রহ্মাস্ত্র হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। আর মহাপ্রয়াণকালে তাঁহাকে এই ব্রহ্মশাপরূপ কলুষকবল হইতে রক্ষা করিলেন কৃষ্ণকথা। কৃষ্ণের নামরূপ গুণ ও লীলা কথা।—কোন্‌টা বড়!

শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন

আমাকে পার করে দাও সুনিপুণা। গঙ্গাতীরে, কিনারে বাঁধা রহিয়াছে একটি তরণী। পারাপারকারিণী রমণী। রমণী যুবতী এবং সুন্দরী। যাত্রী তাপস যুবক। গঙ্গার ওপারে গিয়া ঋষিতনয় রমণীর করগ্রহণ-পূর্বক বলিলেন, 'তোমার যৌবন আমাকে প্রলুব্ধ করেছে সুন্দরী।' রমণী স-সঙ্কোচে নিবেদন করিলেন, 'প্রভু আমি কৈবর্ত কন্যা।' 'তুমি জান না শোভনে, শাস্ত্র বলেছেন স্ত্রীরত্ন দুষ্কুলাদপি।' 'তবে আমার পাণিগ্রহণ করুন ঋষিবর।' এক 'রাজ-সিংহাসন তোমার প্রতীক্ষা করছে ভাগ্যবতি। অচিরেই তুমি সম্রাজ্ঞীর আসন অধিকার করবে। (আমি কুমারী আমার কৌমার) তোমার কুমারীত্বের বিন্দুমাত্র অপহ্নব ঘটবে না সুকুমারি। আমার বরে তুমি এক অমর পুত্রের জননী হবে। যাবৎ চন্দ্র দিবাকর, লোকে তোমার পুত্রের যশোগাথা গান করবে।' 'আমার নাম সত্যবতী, গায়ে আমার আমিষের গন্ধ। তাই নরনারী পিতৃদত্ত নাম ত্যাগ করে আমাকে মৎস্যগন্ধা বলে ডাকে।' 'আমি তোমাকে পদ্মিনীতে রূপান্তরিত করবো। আমার এই স্পর্শ তোমার দেহকে পদ্মগন্ধে সুরভিত করবে। অঙ্গগন্ধে তোমার স্থিতিস্থান আমোদিত হবে।' 'আমার লজ্জা এবং লোকভীতি এই অরুণালোককে উপেক্ষা করতে পারবে না ঋষিসত্তম।' 'আমি এই ক্ষণেই কুহেলিকার সৃষ্টি করছি চারুশীলে। সেই ঘন কুয়াশায় তোমার রূপজ্যোতিও আত্মপ্রকাশে অক্ষম হবে।' সত্যবতী তাপস যুবকের আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ করিলেন। এই ঋষি তনয়ের নাম পরাশর। মনু হইতে বশিষ্ঠ পর্যন্ত বিংশতি সংখ্যক সংহিতাকারগণের মধ্যে পরাশর অন্যতম। এই দুর্দিনেও ভারতের কোন না কোন স্থানে পরাশরের পুণ্যনাম নিত্য কীর্তিত হয়।

যথাকালে সত্যবতী এক পুত্র প্রসব করিলেন। দ্বীপে জন্ম বলিয়া নাম দ্বৈপায়ন। অঙ্গবর্ণ শ্যামল বলিয়া লোকে ডাকিত কৃষ্ণ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন! উত্তর-কালে বেদের বিভাগ করিয়াছিলেন বলিয়া নাম হইয়াছিল বেদব্যাস। অষ্টাদশ পুরাণ ইঁহারই সঙ্কলিত। মহাভারতের ইনিই রচয়িতা। ব্রহ্মসূত্র বেদান্ত-দর্শন কৃষ্ণদ্বৈপায়নই প্রণয়ন করিয়াছিলেন। মহাভারত পুরাণ সংহিতা ব্রহ্মসূত্র—কত গ্রন্থই না রচনা করিলেন ব্যাসদেব। সমগ্র বেদকে ঋক্ সাম যজুঃ অথর্ব—এই চারি অংশে বিভাগ করিয়া দিলেন। তথাপি হৃদয় প্রশান্ত হইল না কেন? মন আজিও অশান্ত কেন? শান্তির প্রত্যাশায় ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হইলেন বেদব্যাস। দেবর্ষি নারদ আসিয়া দর্শন দিলেন। প্রণামপূর্বক পাদ্য অর্ঘ্য নিবেদন করিলেন দ্বৈপায়ন। আসন গ্রহণে আবেদন জানাইলেন। আসনে উপবেশনপূর্বক দেবর্ষি বলিলেন বেদব্যাস, বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছ। কিন্তু ভুবনপাবন শ্রবণমনোরসায়ন হরিকথা তো আলোচনা করিলে না। কোন কোন পুরাণে বা মহাভারতে প্রসঙ্গক্রমে শ্রী কৃষ্ণপ্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছ সত্য। কিন্তু সুবিস্তৃতভাবে মাত্র কৃষ্ণলীলা আলোচনার জন্যই তো কোন বিশেষ পুরাণ রচনা করিলে না। তোমার নিজের তৃপ্তির জন্য এবং ত্রিলোকের কল্যাণ জন্য তুমি শ্রীমদ্‌ভাগবত রচনা কর। হৃদয়ে অপার শান্তি লাভ করিবে। মন প্রফুল্ল হইবে। এই পুণ্য বাসুদেব কথা তিন লোক পবিত্র করিবে। যিনি প্রশ্ন করিবেন যিনি কীর্তন করিবেন আর যিনি শ্রবণ করিবেন, পবিত্র হইবেন এই তিন লোক। ত্রিলোকপাবনী সুরধুনী ধারা যেমন স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্ত্যে ভাগীরথী এবং পাতালে ভোগবতী-রূপে প্রবাহিত হইয়া স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালকে ধন্য করিতেছেন এই পবিত্রতাকে তেমনই তাহারই সমতুল্য বলিয়া জানিও। নারদ বেদব্যাসকে যে উপদেশ দান করিয়াছিলেন, তাহা চতুঃশ্লোকী ভাগবত নামে প্রসিদ্ধ।

শ্রীমদ্‌ভাগবত রচনাপূর্বক ব্যাসদেব পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। মায়ামুক্ত শুকদেব। শুকদেব বহুদিন জননী জঠরেই অবস্থান করিয়াছিলেন। কারণ এই জগৎ আবরিকা শক্তি মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন রহিয়াছে। মায়াময় জগতে আত্মপ্রকাশে তিনি অসম্মত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রার্থনায় মুহূর্তের জন্য মায়া অপসারিত করিয়াছিলেন শ্রীহরি। সেই পুণ্য লগ্নেই ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন শুকদেব। আকুমারব্রহ্মচারী এই শুকদেবই শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রথম পাঠক।

দেবর্ষি নারদ

রামায়ণে, মহাভারতে, শ্রীমদ্‌ভাগবতে এবং অন্যান্য পুরাণে উপ-পুরাণে বহু শ্রুত একটি পুণ্য নাম দেবর্ষি নারদ। ভক্ত প্রহ্লাদকে বাল্যকালে শ্রীনারদই শ্রীকৃষ্ণভক্তির উপদেশ দান করিয়াছিলেন। নারদের উপদেশেই বালক প্রহ্লাদ ভয়কে জয় করিয়া সর্ববিধ বিপদে এমনকি প্রাণ সংশয়েও নিরস্ত্র প্রতিরোধে সমর্থ হইয়াছিলেন। মানবজাতির তথা ব্যক্তির চরম ও পরম বল আত্মবল। আত্মবলে বিজয়ী হইয়াছিলেন বালক প্রহ্লাদ। ব্যক্তি তথা জাতির অমোঘ অস্ত্র এই নিরস্ত্র প্রতিরোধ। ইহার উদ্ভাবয়িতা শ্রীনারদ, প্রয়োগকর্তা প্রহ্লাদ। বালক ধ্রুব দেবর্ষি নারদের নিকটই 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' এই অমৃত মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই মন্ত্রের অন্যতম উদ্গাতা বৈয়াসকি শ্রীশুকদেব। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নকেও বিরাকার করিবার অধিকারী ছিলেন শ্রীনারদ। একদিন শ্রীনারদ ব্যাসাশ্রমে আসিয়া বেদধ্বনি না শুনিয়া গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। ব্যাসদেব তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে অতি বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন আমার শিষ্যগণ (পৈল, সুমন্ত, বৈশম্পায়ন. এবং জৈমিনী) পৃথিবীতে বেদপ্রচারে গমন করিয়াছেন। শিষ্য বিরহে আমার মনে শান্তি নাই! এইজন্যই মৌন হইয়া আছি। নারদ বলিলেন—

> অধীয়তাং ভবান্ বেদান্
> সার্ধং পুত্রেণ ধীমতা।
> বিধুন্বন ব্রহ্মঘোষেন
> রক্ষোভয়কৃতং তমঃ।

ধীমান পুত্র শুকদেবের সঙ্গে বেদাধ্যয়ন কর। ওঙ্কার রবে রাক্ষসভয় দূর কর।

ঋষিগণ তপোবনে বসিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। ঋষিশিষ্যগণ ধর্মপ্রচারে বহির্গত হইতেন। যাহারা লোভী, পরস্ত্রীকাতর, হিংসাদ্বেষ-দুষ্ট, অসত্য-পরায়ণ, দুর্নীতির ধারক এবং বাহক, দুর্বলের শোষক ও শাসক, তাহারাই রাক্ষস। ইহারাই দেশকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে। ব্রহ্মঘোষে ধর্ম আবির্ভূত হন, অন্ধকার বিদূরিত হয়।

মহর্ষি বাল্মীকি দেবর্ষি নারদের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন—

সম্পদে কে থাকে ভয়ে বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,

কে পেয়েছে সব চেয়ে কে দিয়েছে তাহার অধিক
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরা মাঝে দুঃখ মহত্তম

কোন নরোত্তমকে আশ্রয় করিয়া সমগ্রী লক্ষ্মী মূর্তিমতী হইয়াছেন—

দেবর্ষি বলিলেন—এতগুণ তো দেবতাগণের মধ্যেও দেখিতে পাই না ; তবে এক নরচন্দ্রমার মধ্যে এই সমস্ত গুণ একত্রিত দেখিয়াছি তাহার নাম বলিতেছি শোন—

দেবেষ্বপি ন পশ্যামি কশ্চিদেভিগু´নৈর্য ুতম।
শ্রুয়তাংতুগুনৈরেভির্যোযুক্তো নরচন্দ্রমা।।
কহমোরে সর্বদর্শী হেদেবর্ষি তার পুণ্য নাম।
নারদ কহিলা ধীরে অযোধ্যার রঘুপতি রাম।

মহাভারতে নারদ বারবার আবির্ভূত হইয়াছেন। দেবর্ষি রাষ্ট্রনীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী ছিলেন। মাত্র রাষ্ট্রনীতি নহে—ইতিহাস ও পুরাণে যুদ্ধ-বিদ্যায়, সন্ধিবিগ্রহে, বেদ ও উপনিষদে, অর্থশাস্ত্রে এবং সঙ্গীতবিদ্যায় দেবর্ষির সমান অধিকার ছিল।

"নারদ পঞ্চরাত্র" পাঞ্চরাত্র ধর্মের একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। নারদ প্রণীত সঙ্গীতগ্রন্থও বিশেষ প্রসিদ্ধ। কৌটীল্য স্বীয় অর্থশাস্ত্রে পূর্বাচার্যগণের নাম করিতে গিয়া "পিশুন" বিশেষণে নারদের নাম করিয়াছেন।

ব্যাসদেবকে তিনিই শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রণয়নের উপদেশ দিয়াছিলেন। বির্ষম, অশান্ত ব্যাস তাঁহার উপদেশ প্রার্থনা করিলে নারদ বলিয়াছিলেন—বিশেষরূপে শ্রীহরির রূপ-গুণ-লীলা বর্ণনা কর। মনে অবিচল শান্তি পাইবে। এই উপদেশের অমৃত ফল শ্রীমদভাগবত। শ্রীমদ্‌ভাগবতেও বার বার নারদকে দেখিতে পাই। নিষ্কাম ভক্তির, অহৈতুক ভক্তির উপদেষ্টা তিনি। কদাচারীকে দণ্ড দিয়েছেন, উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া তাহার হৃদয়ে হরিভক্তির বীজ রোপণ করিয়াছেন। ঋষিসমাজে নারদ এর বিচিত্র চরিত্র।

তিনি আপনার তিন জন্মের পরিচয় দিয়েছেন। প্রথম জন্মে উপবহন নামে গন্ধর্ব ছিলেন। অসদাচরণে জীবন অতিবাহিত করিয়া পরজন্মে এক তপোবনে দাসীপুত্ররূপে আবির্ভূত হন। ঋষির আশ্রমে সর্বদা সাধুসঙ্গে এবং যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন ভোজনে তিনি সর্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন। হরি-কথায় তাঁর রতি লাভ হয়। একদিন সর্পদংশনে জননীর প্রাণ বিয়োগ ঘটিলে নারদ হিমালয়ে প্রস্থান করেন। ঋষিগণের মুখে যেমন শুনিয়াছিলেন সেইরূপ

উপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া আপন বুদ্ধিকে অন্তরাত্মায় কেন্দ্রীভূত করিলে তাঁহার অমল অন্তরে শ্রীভগবানের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু সেই আবির্ভাব যেন চকিতের বিদ্যুৎ বিকাশ। অদর্শনে আর্ত নারদ আকুল হইয়া উঠিলে দৈববাণী শুনিলেন, হে নিষ্পাপ, আমি তোমার অনুরাগ বৃদ্ধির জন্যই তোমাকে দর্শন দান করিলাম। যাহাদের অন্তরের মলিনতা সম্যক অপসারিত হয় নাই, তাহাদের পক্ষে আমার দর্শন প্রাপ্তি দুর্ঘট।

তৃতীয় জন্মে তিনি ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপে আবির্ভূত হন। চিন্ময় দেহ তাঁহার, চিরতরুণ তিনি। দেবদত্ত বীণাযন্ত্রে অবিরাম হরিকীর্তনপরায়ণ দেবর্ষি এইবার জগদগুরুরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। সর্বজীবে সমদর্শী তিনি। অকপট ভক্তিপথযাত্রীর জাতিভেদ নাই তাঁহার নিকটে। সর্বত্রই তাঁহার অবারিত গতি। ভক্তকেই সাহায্য করা যেন তাঁহার ব্রত। কিন্তু তাই বলিয়া কোন গৃহী, কি কোন সম্রাট, কোন রাজা বা রাজপুরুষ, কোন সন্ন্যাসী, কি কোন ভিক্ষুক প্রার্থনা করিলে কেহই তাঁহার দিব্য উপদেশ লাভে বঞ্চিত হন নাই। বাঙ্গালার মঙ্গলকাব্যে তাঁহার অবাধ সঞ্চরণ। কাহিনী কিম্বদন্তীতেও নারদের আবির্ভাব বিরল নহে। কলহের দেবতারূপেও তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের চক্ষে ভক্ত ও সজ্জনগণের উপদেষ্টা, সর্বভূতের হিতকামী—একাধারে ভক্ত, জ্ঞানী ও নীতিমান, হরিগুণগাননিরত নারদের চিত্রই চির উজ্জ্বল।

ভাগবত ধর্ম্মের মূলকথা

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচিং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রাকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু॥

যিনি প্রণয়িনী ব্রজবধূগণের রসরাশি অপহরণপূর্বক অপার ভাবমাধুর্য্য আস্বাদন বিনোদে আকাঙ্ক্ষিত হইয়া তাঁহাদের দেহদ্যুতি গ্রহণে স্বীয় শ্যামকান্তি গোপন করিয়াছেন, ভাবরসের সেই চিন্ময় বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমাদিগকে কৃপা করুন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাধনা, ভাব-রসের সাধনা। পরকীয়া ভাবের উপাসনা। একদিন দেখিয়াছিলাম সাহিত্য—বৈষ্ণবসাহিত্য ছিল তাঁহাদের সাধন, ভাব ছিল তাঁহাদের সাধ্য। বৈষ্ণব সাহিত্যের মাধ্যমেই তাঁহারা মহাভাবস্বরূপিণীর আনুগত্য লাভ করিয়াছিলেন; রস-স্বরূপের আস্বাদন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই সাধনার প্রবর্ত্তক এবং পথপ্রদর্শক। আপনি আচরণপূর্বক এই পথে পদাঙ্ক অঙ্কিত করিয়া তিনি মানবকে পথ দেখাইয়াছেন। মানবের অবশ্য-গন্তব্য আনন্দ-নিকেতন শ্রীবৃন্দাবনের সন্ধান দান করিয়াছেন। জনসাধারণের মধ্যে এই সাধন-রহস্য বিতরণই তাঁহার চির-অনর্পিত পরম বস্তু। ভাবুক ও রসিক না হইলে এ বস্তুর মর্ম উপলব্ধি হইবে না, এ সাধনের রহস্য বুঝিবার সামর্থ্য জন্মিবে না। এই জন্যই রহস্যগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত নির্দ্দেশ দিয়াছেন—

পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ

ওগো রসবিশেষ ভাবনা-চাতুর ভাবুক ও রসিকগণ, ভাগবত-ধর্ম্মের পরমানন্দ রস বিলয়কাল পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ পান কর।

ভাব ও রসের সাধনা ভিন্ন জাতি গঠন একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে কোন ভাবে হউক, যে কোন রসে হউক, জাতিকে মাতাইয়া মজাইয়া, জাতিকে একপ্রাণ, একভাবের ভাবুক, একই রসের রসিক করিতে পারিলে আপনা হইতেই জাতীয়তার অভ্যুদয় ঘটে। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে

বৈষ্ণবের সাধনাই বাঙ্গালায় প্রথম দেখাইয়াছিল জাতি ও সাহিত্য অঙ্গাঙ্গী ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে। জাতি সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছে, সাহিত্য জাতি গঠন করিতেছে। তে হি নো দিবসা গতাঃ। সে দিনের কথা আজ কাহিনী হইয়াছে। প্রকৃত বৈষ্ণবের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে, সাধনপন্থা লোপ পাইতে বসিয়াছে, সুতরাং আজিকার দিনে এ কথা আলোচনার প্রয়োজন হইয়াছে।

বৈষ্ণব সাধনার কথা বলিতে হইলে রসের কথা বলিতে হয়, ভাবের কথা বলিতে হয়; পরকীয়া ভাবের কথাই বলিতে হয়। জগতে ঘটনাপ্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে, জীবনে নিত্যনূতন পরিবর্তন ঘটিতেছে। ইহার সমস্তটা সত্য নহে। ইহা নশ্বর, মুহূর্ত্তমাত্র স্থায়ী। ইহার সত্য-স্বরূপের সন্ধান করিতে হইলে পরকীয়া ভাবের আশ্রয় লইতে হইবে। এই ক্ষণ বিধ্বংসী ঘটনাবলী এবং জীবনস্রোত, এক কথায় জগতের সমস্ত বস্তুর মূলে যে শাশ্বত সনাতন সত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে সেই অনির্বচনীয় অবিনশ্বর সত্বাই ভাব এবং রসের মিলিত স্বরূপ। পরকীয়া ভাবেই তাহার উপলব্ধি সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইয়াছে। কথাটা হেঁয়ালীর মত শুনাইতেছে, সাধ্যমত পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। রস এবং ভাবের কথা বলিতেছি। প্রসঙ্গত বৈষ্ণব-সাহিত্যের কথাও বলিতেছি। দেশে দেশে কালে কালে সাহিত্যের একই রূপ। রস যাহার আত্মা, ভাব যাহার শক্তি, শব্দ যাহার আকার এবং অবয়ব, অর্থ যাহার প্রাণ, অলঙ্কার যাহার অঙ্গসৌষ্ঠব, ছন্দ যাহার গতি, তাহাই বৈষ্ণব-সাহিত্য। সত্যকার সাহিত্য সম্বন্ধেই এই সংজ্ঞা প্রয়োগ করিতে পারি।

রস শক্তিমান্, ভাব শক্তি। রস ধর্ম্মী, ভাব ধর্ম্ম। "রস্যতে ইতি রসঃ"। যাহা আস্বাদনীয়, যাহা আস্বাদন-যোগ্য তাহাই রস। লৌকিক জগতে যেমন তিক্ত কষায়াদি, সাহিত্য জগতেও তেমনই আদি, বীর প্রভৃতি রসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ভূ ধাতুর অর্থ হওয়া। 'ভবতীতি ভাবঃ'। একটা কিছু হওয়া, একটা সৃষ্টি, একটা নির্দিষ্ট আকার পাওয়াই ভাব। সৃষ্টি অর্থে ভব, ভবের প্রকাশ ভাব। ভাবের আবির্ভাব ভিন্ন সৃষ্টি হয় না। ঋষি বলিলেন ব্রহ্ম রসস্বরূপ—"রসো বৈ সঃ।" তিনি অনাদি, কিন্তু তিনিই সকলের আদি তাই তিনিই আদিরস। রসস্বরূপ ঈক্ষণ করিলেন, কামনা করিলেন—"তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়" (ছান্দোগ্য), "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়" (তৈত্তিরীয়)। এই যে ঈক্ষণ, এই যে কামনা, ইহাই ভাব। এই ভাবই শক্তি, ব্রহ্মের ইচ্ছা শক্তি, মূলশক্তি। শক্তি যেমন ব্রহ্মকে উদ্বুদ্ধ করেন, জগৎরূপে

পরিণত করেন, সাহিত্য জগতেও তেমনই ভাবই রসকে রূপায়িত করে প্রকাশ করে। রসের স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে বিশ্বনাথ কবিরাজ বলিয়াছেন—

সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডঃ স্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ॥

রস সত্ত্বোদ্রেককারী, অখণ্ড, স্বপ্রকাশ, আনন্দচিন্ময়, বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য এবং ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর। এই স্বপ্রকাশ অর্থে স্ব-শক্তিতে প্রকাশিত। ভাবই সেই শক্তি, রসের স্বরূপ শক্তি বা অন্তরঙ্গাশক্তি, যে শক্তিতে রস স্বপ্রকাশ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—"আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান", প্রেম ভাবেরই অঙ্কুর, আবার প্রেম রসেরও অঙ্কুর, সুতরাং ভাবও চিন্ময়। "নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম বিক্রিয়া"। ইহাও সেই ঈক্ষণের কথা, সেই কামনার কথা। বহু হইবার ইচ্ছায়, আপনাকে বিলাইবার কামনায় ব্রহ্মের চাঞ্চল্যই ভাব। বাস্তবিক ভাব এবং রসে কোন প্রভেদ নাই, আবার ভাব ও রস অভেদও নহে। এই ভেদাভেদ অচিন্ত্য। প্রাচীনগণ বলিয়াছেন—

ন ভাব হীনোঽস্তি রসো ন ভাবোরসবর্জ্জিতঃ।
পরস্পর কৃতাসিদ্ধিরনয়ো রসভাবয়োঃ॥

রস অখণ্ড, রস বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য। রস ভাবের বশীভূত, ভাবের ঘরে অপর কাহারো প্রবেশাধিকার নাই। মিলনই ইহার প্রকৃতি, একাত্মতাই ইহার ধর্ম্ম। মাথুর বিরহ কীর্ত্তন হইতেছে, অধ্যাপক, ব্যবহারজীবী, কৃষক, বণিক, শিল্পী সকলে মিলিয়া শুনিতেছি। তন্ময় হইয়া গিয়াছি। গোপীবিরহ সিন্ধুতে আপন হারাইয়াছি। স্ব স্ব স্বভাব ভুলিয়াছি—বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য হইয়াছি। বিশ্বনাথ কবিরাজ ইহার নাম দিয়াছেন "সাধারণীকৃতি"। ইহাই সাহিত্য। সহিতের ভাব।

"ব্যাপারোঽস্তি বিভাবাদের্নাম্না সাধারণী কৃতিঃ"

সাধারণকে সম্মিলিত করিবার জন্য, তাহাদের সাহিত্য সৃষ্টির জন্য, এই সাধারণীকৃতি সাধনের জন্যই বৈষ্ণবগণ সাধারণের মধ্যে ভাবরসময়ী ভগবানের নাম গুণ লীলা কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তন ও প্রচার করিয়াছিলেন। এই অবস্থায়—

"পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ।
তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে॥"

যাহা পরস্ব হইয়াও পরের নয়, নিজস্ব হইয়াও আমার নয় অথচ বিভাবাদি সহযোগে আস্বাদনে যাহার কোন পরিচ্ছেদও নাই তাহাই আনন্দ। ইহাই চমৎকৃতি। ইহাই রস এবং ভাবের স্বভাব। রস ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর। এই

জন্যই বহুদিন হইতে বলিয়া আসিতেছি, সাহিত্যের রস এবং যোগী, জ্ঞানী ও ভক্তসম্প্রদায়ের অন্বেষণীয় বেদান্ত-প্রতিপাদিত রস মূলে এক নহে। লৌকিক সাহিত্যের ভাব নশ্বর আর ভগবৎ প্রসঙ্গ লইয়া রচিত রচনার ভাব অবিনশ্বর। আনন্দই ইহার স্বরূপ। রসহ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি। এই আনন্দের পার্থক্য আছে।

প্রাচীন আলঙ্কারিক ভরতমুনি বলিয়াছেন বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সহযোগে রস-নিষ্পত্তি হয়। অর্থাৎ এই তিনের সম্মিলিত রূপ স্থায়ী-ভাবই রসকে প্রকাশ করে, রস আস্বাদনের সহায়ক হয়। অন্তরকে বিভাবিত করে, রসকে উদ্রিক্ত করে, তাই নাম হইয়াছে বিভাব। বিভাবের পশ্চাৎ উদিত হয় বলিয়াই পণ্ডিতগণ নাম দিয়াছেন অনুভাব। আর যাহা বিশেষরূপে অভিমুখে বিচরণশীল, ভাবের সেই অংশের নাম ব্যভিচারী ভাব। বিভাবের দুইটি রূপ, আলম্বন ও উদ্দীপন। এই জগত, এই বিশ্ব-প্রকৃতিই উদ্দীপন বিভাব। শ্রীজয়দেব এই রহস্যই বর্ণন করিয়াছেন—

সরসবসন্তসময়বনবর্ণনমনুগতমদনবিকারং।
শ্রীজয়দেব ভণিতমিদমুদয়তি হরিচরণস্মৃতিসারং॥

পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু, জায়া, কন্যা সকলেই উদ্দীপন বিভাব, আলম্বন সেই রস স্বরূপ।

জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে ব্রহ্মের যেমন তিন শক্তি—ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি। অর্থাৎ হ্লাদিনী, সম্বিৎ ও সন্ধিনী, অথবা অনুভূতি, বোধ এবং কর্ম্মশক্তি। সাহিত্য সৃষ্টি ব্যাপারে ভাবেরও তেমনই তিন রূপ, ব্যঞ্জনা, লক্ষণা এবং অভিধা। সুবিধার জন্য অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা এই ক্রম-পর্য্যায় গ্রহণ করিতেছি। শব্দের উচ্চারণ মাত্র যাহা সহজে প্রতীত হয়, সেই মুখ্যার্থবোধক বৃত্তিই অভিধা। যাহা পরম্পরাগত অভিধানের প্রকাশক, তাহাই অভিধা। মুখ্যার্থের বাধা ঘটিলে যাহার দ্বারা বাচ্য সম্বন্ধযুক্ত অন্য পদার্থ বিষয়িনী প্রতীতি জন্মে তাহাই লক্ষণা। অথবা শক্যার্থের অবিনাভূত অর্থাৎ অসাধারণ সম্বন্ধবিশেষযুক্তা পদার্থের প্রতীতির নামই লক্ষণা। আর অভিধা, লক্ষণা, আক্ষেপ ও তাৎপর্য্য জনিত বোধ সমাপ্ত হওয়ার পর ধ্বন্যর্থ বোধের কারণীভূত যে ব্যাপার প্রতীয়মান হয় তাহারই নাম ব্যঞ্জনা। এ বিষয়ের একটি পরিচিত উদাহরণ 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ"। ঘোষ গঙ্গাবাস করিতেছে। এস্থলে ঘোষ পল্লী অর্থ ত্যাগ করিয়া ঘোষকে ব্যক্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছি। অভিধা বৃত্তিতে গঙ্গা বলিতে সুপ্রসিদ্ধা স্রোতস্বিনী বুঝায়। লক্ষণা বৃত্তিতে তাহার তীরভূমি বা

গঙ্গার বক্ষস্থিত নৌকা বুঝিতে হয়, গঙ্গা-তীরে বা গঙ্গাবক্ষে বাস করার কারণ তাহার শৈত্যাদিগুণ, তাহার পাবনীশক্তি ইত্যাদি। যে বৃত্তিতে এই গুণ ও শক্তি বুঝাইতেছে, ঘোষের গঙ্গাবাসের কারণ জানাইয়া দিতেছে, তাহাই ব্যঞ্জনাবৃত্তি।

ভাবের স্বকীয়া পরকীয়া ভেদ আছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যে পরকীয়া ভাবের স্থান অতি উচ্চে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন—

পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥

পরকীয়া একটী ভাব, এইভাবেই রসোল্লাসের চরম ও পরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। কিন্তু ব্রজ ভিন্ন অন্যত্র ইহার অবস্থিতি নাই। সাহিত্যে রসরূপের ব্যঞ্জনাই পরকীয়া ভাব। বৈষ্ণব সাহিত্য বুঝিতে হইলে ব্যঞ্জনার আশ্রিত হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। জগতের যে কোন রস-রহস্যের মর্ম্মগ্রহণ করিতে হইলে ব্যঞ্জনার শরণ লইতে হইবে। বৈষ্ণব সাহিত্যের আকর রত্নস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যঞ্জনাই প্রধান। বৈষ্ণবের সাধনা এই ব্যঞ্জনার সাধনা।

ব্যঞ্জনার একটী উদাহরণ দিতেছি। নীলাচলে রথযাত্রা। প্রেমবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব রথাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে গান করিতেছেন—সামান্যা নায়িকার উক্তি একটী আদিরসের শ্লোক,—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢাঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসী তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥

যিনি আমার কৌমার হরণ করিয়াছেন, সেই আমার অভিমত বর। সেই চৈত্রমাসের রাত্রি। সেই উন্মীলিত মালতী সুরভিত প্রৌঢ় কদম্ব বনবায়ু। সখি, তথাপি আমাদের সুরত ব্যাপারে রেবা নদীর তীরস্থিত বেতসী তরুতলের জন্য আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে। অভিধার ইহাই অর্থ। লক্ষণা স্মরণ করাইয়া দিতেছে—কৈশোরের গত দিনের স্মৃতি। সেই চারি চক্ষের সহসা মিলনে সঞ্জাত প্রেম। নর্ম্মদার বেতসীতরুকুঞ্জে সেই বহু প্রতীক্ষিত ঈপ্সিত প্রথম সমাগম। তাহার পর দীর্ঘদিনের অদর্শন, বহুদিন পরে পুনরায় এই মিলন ইত্যাদি। সাধারণের সন্দেহ হইল শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মুখে এই সামান্যা নায়িকার কথা এই আদিরসের শ্লোক! একমাত্র শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদরই এই শ্লোকের অর্থ জানিতেন। দৈবাৎ সে বৎসর শ্রীল রূপ গোস্বামী শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন।

তিনি মহাপ্রভুর কৃপায় শ্লোকের ব্যঞ্জনা বুঝিলেন, বুঝিয়া তালপত্রে ভাবানুরূপ একটি শ্লোক লিখিলেন। তালপত্রখানি ব্রহ্ম হরিদাসের কুটীরের চালে রাখিয়া শ্রীরূপ সমুদ্র স্নানে গিয়াছেন, এমন সময় শ্রীজগন্নাথ দেবের উপল ভোগ দর্শনান্তে মহাপ্রভু ব্রহ্ম হরিদাসের কুটিরে আসিয়া ইতি উতি চাহিতে তালপত্রখানি দেখিতে পাইলেন। তালপত্রে শ্রীরূপ লিখিত শ্লোক পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলেন। পাঠ করিলেন—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণ সহচরি কুরুক্ষেত্রে মিলিত—
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োসঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥

বহুদিনের অদর্শন। বৃন্দাবন হইতে মথুরা, তথা হইতে দ্বারকা, মনে হয় যেন কত যুগ, কত যুগান্তর বহিয়া গিয়াছে। তাহার পর এই কুরুক্ষেত্রে মিলন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে সূর্য্যগ্রহণে তীর্থস্নান উপলক্ষ্যে কুরুক্ষেত্রে আসিয়াছেন। সঙ্গে অগণিত যাদব সৈন্য, উগ্রসেন, বসুদেব, সাত্যকি, প্রদ্যুম্ন প্রমুখ যাদব প্রধানগণ। জননী দেবকী ও মহিষী রুক্মিণী আদি পুরমহিলাগণও সঙ্গে আছেন। অশ্ব, হস্তী, ও রথের সংখ্যা নাই। ভারতের রাজন্য-মণ্ডলীও তীর্থস্নানে এবং কৃষ্ণদর্শনে কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গেও মর্য্যাদানুরূপ সৈন্যবাহিনী। সংবাদ পাইয়া শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে আসিয়াছেন পিতা নন্দ, জননী যশোদা ও শ্রীদামাদি ব্রজরাখালগণ এবং অপরাপর গোপগোপীবৃন্দ। আর আসিয়াছেন সখীযূথপরিবৃতা শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণী। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেন, কৃষ্ণের সঙ্গে বহুবাঞ্ছিত মিলনে সম্মিলিতা হইলেন। কিন্তু কোথায় যেন ব্যবধান থাকিয়া গেল। রাজবেশ, হাতী, ঘোড়া, মনুষ্য, গহনে তিনি বৃন্দাবনের জন্য উতলা হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—সহচরি, সেই আমার প্রিয় দয়িত কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, সেই আমি রাধা, সেই আমাদের সঙ্গমসুখ, তথাপি মুরলীর মধুর পঞ্চমে লীলায়িত অন্তঃপ্রদেশ, কালিন্দীর পুলিনপরিগত ব্রজবনস্থলীর জন্য আমার মনে স্পৃহা জাগিতেছে। ইহাই মহাপ্রভুর মনোভাব। মহাপ্রভুর পরিগীত শ্লোকের ইহাই ব্যঞ্জনা। ইহাই রসের পরকীয়া ভাব। বৈষ্ণবগণ এই পরকীয়া ভাবেরই সাধনা করেন। রসজ্ঞ কবি কবিকর্ণপুর এই জন্যই অলঙ্কার-কৌস্তুভের মঙ্গলাচরণে ব্যঞ্জনাকে বন্দনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যেই আমার কথিত রহস্যের ইঙ্গিত নিহিত রহিয়াছে।

স জয়তি যেন প্রভবতি দৃশি সুদৃশাং ব্যঞ্জনা বৃত্তিঃ।
অতিশয়িতপদপদার্থোধ্বনিরিব মুরলীধ্বনির্মুরারাতেঃ।

পদ পদার্থের অতিরিক্ত যে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা,—তিনি যেমন কাব্য-জগতের অধীশ্বরী, তেমনই সকল ধ্বনির ললামভূত মুরারির যে মুরলীধ্বনি,—ব্রজ-বিলাসিনী ধনীগণের নয়নে উদ্বেলিত আনন্দাশ্রুদ্বারা অঞ্জনরেখার বিলোপহেতু ব্যঞ্জনা অর্থাৎ বিগতাঞ্জনা বৃত্তি সম্পাদিত করে, বৈকুণ্ঠাদি পদ এবং ব্রহ্মানন্দাদি পদার্থ হইতে উৎকর্ষশালী সেই মুরলীধ্বনির জয় হউক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বৈষ্ণবের সাধনা ভাব-রসের সাধনা, পরকীয়া ভাবের উপাসনা, এক কথায় ভাগবত-ধর্ম্মের সাধনা। শ্রীমদ্ভাগবতই এই সাধনপথের আলোকস্তম্ভ। একাধারে সাধনা ও সিদ্ধির রহস্যগ্রন্থ। অত্যন্ত দুর্দ্দিনেই আমরা সম্মিলিত হইয়াছি। অতীতের এমনই এক দুর্দ্দিনেই শ্রীমদ্ভাগবত অভ্যুদিত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ে যেখানে শ্রীমদ্ভাগবত কথার সূচনা হইয়াছে, সেই উপক্রমের পটভূমিকায় যে ভয়াবহ চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহার সঙ্গে আজকার দিনের পার্থক্য—মাত্র দেশ কালেরই পার্থক্য। ঋষি বর্ণন করিতেছেন—

পরীক্ষিতোহথ রাজর্ষের্জন্মকর্ম্মাবিলাপনম্।
সংস্থাঞ্চ পাণ্ডুপুত্রাণাং বক্ষ্যে কৃষ্ণকথোদয়ম্॥

এইরূপে কৃষ্ণকথা উদয়ের সূচনা করিয়া পরক্ষণেই তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষ দৃশ্যপট চক্ষের সম্মুখে মেলিয়া ধরিলেন,—

যদামৃধে কৌরবসৃঞ্জয়ানাং বীরেষথো বীরগতিং গতেষু।
বৃকোদরাবিদ্ধগদাভিমর্ষভগ্নোরুদণ্ডে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রে॥

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। অনলোদগারী অস্ত্র সংঘাত, বীরেন্দ্রবৃন্দের আস্ফালন, অশ্বের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহন, সৈন্যগণের কোলাহল, আহতের আর্ত্তনাদ সমস্ত স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। ভারতের পরাক্রান্ত রাজন্যগণ কৌরব পাণ্ডব কোন না কোন পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন, সকলেই নিহত হইয়াছেন। দূরবিস্তৃত প্রান্তর ব্যাপিয়া এখন শুধু শুনিতে পাইতেছি—শৃগাল কুকুরের কোলাহল এবং শোকার্ত্তগণের বিলাপধ্বনি। এই মহাশ্মশানের অদূরে দ্বৈপায়ন হ্রদতীরে বৃকোদরাবিদ্ধ গদাভিমর্ষে ভগ্নোরুদণ্ড ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ভারত সম্রাট দুর্য্যোধন ভূমিশয়ানে শায়িত রহিয়াছেন। একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য নাই, শত ভ্রাতা সহায় নাই, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য সেনাপতি নাই। পুত্র লক্ষ্মণ নাই। সে বিশাল সাম্রাজ্যও স্বপ্নরাজ্যে মিলাইয়া গিয়াছে। কুহমাবৃত পর্য্যঙ্কে

দুগ্ধফেননিভ শয্যায় দিব্যস্ত্রীগণের চারুকরধৃত চামরবীজনে যিনি বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেন, আজ পূতিগন্ধময় শবরাশি মধ্যে রক্তাক্ত রণক্ষেত্রের কঙ্করাকীর্ণ প্রান্তরে ভূতলশয়নে তিনি একক। নয়নে নিদ্রা নাই, জীবন্তে ভক্ষণাভিলাষী আক্রমণোদ্যত সমীপবর্ত্তী শৃগাল কুক্কুরকে প্রতিহত করিবারও তাঁহার সামর্থ্য নাই। কি শোচনীয় পরিণাম!

অতঃপর নিস্তব্ধ নিশীথে পাণ্ডবশিবিরে উপাংশু হত্যা, পাণ্ডব-বংশ নির্ব্বংশ করিবার জন্য অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ, পৈশাচিক প্রতিহিংসায় ভ্রূণহত্যার প্রয়াস। সমস্ত বিপদ বিদূরিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক উত্তরা-গর্ভস্থ শিশুর পুনরুজ্জীবন, বিষ্ণুরাত পরীক্ষিতের প্রাণপ্রাপ্তি। ইহাই বাসুদেব কথার —শ্রীমদ্ভগবতের অধিষ্ঠান ভূমি। এই ভীষণ শ্মশানে—এই ধ্বংসস্তুপে দাঁড়াইয়া স্বতঃই প্রশ্ন জাগে "ততঃ কিম্"? পার্থিব ঐশ্বর্য্যের এই পরিণাম। বল-বীর্য্য-মদোদ্ধত মাৎসর্য্যের এই পরিণতি। মানব, সারা জীবন ধরিয়া তুমি কি এই মহতী বিনষ্টির আরাধনা করিয়াছ? অমৃতের সন্তান তুমি, এই রুধির-প্রদিগ্ধ ভোজ্য লইয়াই কি চিরতৃপ্ত থাকিবে? শ্রীমদ্ভাগবত এই জিজ্ঞাসারই উত্তর দান করিয়াছেন।

সে দিনে এ দিনে পার্থক্য কোথায়? পররাজ্য লিপ্সার লেলিহান বহ্নিজ্বালা, মারণাস্ত্র আবিষ্কারের উন্মত্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিশ্ববিধ্বংসী সভ্যতার ক্রব্যাদ-কাপট্য, আজিও তো অহংকৃত ঔদ্ধত্যে, দর্পিত পদক্ষেপে ধরিত্রীকে নিপীড়িত করিতেছে! লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই, ন্যায় নাই, নীতি নাই, দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই। পৃথিবীর কি অন্তিম দশা উপস্থিত হইয়াছে? মনুষ্যত্ব কি পাতালে পলায়ন করিয়াছে? এই সেদিনও বাঙ্গালায় কি দেখিয়াছি! চক্ষের সম্মুখে দেখিয়াছি—একদিকে কাতারে কাতারে নরনারী ধনীর দ্বারে উচ্ছিষ্ট প্রত্যাশী, কঙ্কালসার, বুভুক্ষু। অন্যদিকে খ্যাতনামা ব্যবসায়ী, উচ্চপদস্থ রাজবল্লভ, সুপরিচিত সমাজপতি, প্রেত পিশাচ ও রাক্ষসের দল সম্মিলিত ভাবে বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করিতেছে, মহামারীকে আহ্বান করিয়া আনিতেছে। দেখিলাম, লক্ষ লক্ষ মণ মানব-ভোজ্য তাহাদের জঘন্য ষড়যন্ত্রে ভূগর্ভে মিলাইয়া গেল, কোথাও বা পশুর অখাদ্যে পরিণত হইয়া বিষ-বায়ুর সৃষ্টি করিল। আর রাজধানীর রাজপথে অগণিত বালক, বৃদ্ধ, যুবা, বৃদ্ধা, বালিকা যুবতী আমাদেরই স্বজাতি আপনার জন বাঙ্গালার অধিবাসী অনাহারে পশুপালের মত প্রাণত্যাগ করিল। কাল অন্নাভাবে পঞ্চাশ লক্ষ লোক ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে, আজ বস্ত্রাভাবে লক্ষ লক্ষ নর-নারী লজ্জায় বাঁচিবার

পথ খুঁজিতেছে। এই যে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ, এই যে কৃমিকীটের মত ঘৃণ্য জীবনযাপন, এই যে তিলে তিলে আত্মহত্যা, এই যে মৃতকল্প হইয়া বাঁচিয়া থাকা, ইহাতে লাভ কি! ইহার মধ্যে সার্থকতা কোথায়, আনন্দ কোথায়? এই দুরবস্থা দূরীভূত করিতে হইবে। জগতের মধ্যে মানুষের মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইবে। এইজন্য প্রয়োজন মানবতার সাধনা, মানুষ হওয়ার প্রয়াসে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ। ভাগবত-ধর্ম্মের আচরণে এই প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। প্রাণে বল এবং মনে সাহস জাগিবে। মনুষ্যত্বের সাধনায় স্বারাজ্য-সংসিদ্ধি লাভ করিয়া আমরা অমৃতস্বাদে ধন্য হইব। আমাদের কুল পবিত্র এবং জননী কৃতার্থা হইবেন। এ দুর্দ্দিন ইতিহাসেরও অজ্ঞাত। এমনই দুর্দ্দিনেই ভাগবত-ধর্ম্ম প্রচার প্রয়োজন। এমন প্রয়োজন বোধহয় পূর্ব্বে কোন দিন উপস্থিত হয় নাই। প্রচার করিতে হইলেই আচরণ করিতে হইবে, ঐকান্তিক নিষ্ঠায় এই ধর্ম্মকে জীবনে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে হইবে। তবেই প্রচারের অধিকার মিলিবে।

আজিকার দিনে এমন অনেককে দেখিয়াছি যাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মকে ঘৃণা করেন। ইহারা মহাপ্রভুর নিন্দা করিতেও কুণ্ঠিত হন না। ইঁহাদের মতে মহাপ্রভু বাঙ্গলার মহা অনিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। চিরজীবন তিনি কাঁদিয়াই কাটাইয়াছেন। তাঁহার চোখের জল জাতিকে দুর্ব্বল করিয়াছে, জাতি যুদ্ধ-বিগ্রহ ভুলিয়া পরাধীন হইয়াছে ইত্যাদি। ইঁহাদের কথার উত্তরে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—অগ্নির উপকারিতা তো সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু সেই অগ্নিই যে জীববিশেষের লাঙ্গুলের আশ্রয়ে সোনার লঙ্কা ছারখার করিয়াছিল সে দোষ কি অগ্নির, না সেই লাঙ্গুলধারীর? কেহ কেহ বলেন—লোভের বশে অথবা কোন উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া আপনি যদি অপক্ব মৃন্ময়পাত্রে উষ্ণ দুগ্ধ সংগ্রহ করিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে পাত্রটী তো নষ্ট হইবেই, দুগ্ধও নষ্ট হইয়া যাইবে। এমনকি উষ্ণ দুগ্ধ স্পর্শে আপনার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিস্ফোটকেরও উদ্ভব ঘটিতে পারে। এই সমস্ত বিতণ্ডার মধ্যে না গিয়াও এ কথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারা যায় যে, বৈষ্ণব ধর্ম্ম ভীরুর ধর্ম্ম নহে, দুর্ব্বলের ধর্ম্ম নহে। অভয় মন্ত্রের সাধনাই বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রথম সোপান। ইহা কাপুরুষ বা ক্লীবের আচরণীয় নহে।

ভাগবত ধর্ম্ম যুদ্ধ বিগ্রহকে অস্বীকার করেন না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বহুবার যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার প্রেমের রাজ্য বৃন্দাবনে বিনা অস্ত্রে মাত্র বাহু প্রহরণেই তিনি বহু দৈত্যদানবকে বধ করিয়াছিলেন। এই শ্রীকৃষ্ণই বীর-বাঞ্ছিত যুদ্ধক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে অস্ত্র ধারণ করেন নাই। আবার মথুরা দ্বারকায়

তিনি কোন দিনই কোন যুদ্ধেই পরাঙ্মুখ হন নাই, এমন কি যুদ্ধের সাহায্যেই তিনি নিজ বংশের ধ্বংস সাধন করিয়াছেন। নিন্দুকগণ এই সমস্ত কথার আলোচনা করেন না, এই রহস্যের মর্মোদ্ঘাটনের চেষ্টা করেন না। অথচ বংশীধারীকে ইহারা দেখিতে পারেন না। হয়তো দেখিতে জানেন না বলিয়াই পারেন না।

যুদ্ধ-বিগ্রহের উপদেশ না দিয়া, রাজনীতি প্রচার না করিয়া, মহাপ্রভু যে কোনরূপ অন্যায় করিয়াছেন এরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই মানব-জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে, একটা আদর্শ আছে। মানুষ পশু নহে। নখ দন্ত লইয়া অথবা তাহারই সর্ব্বোত্তম সংস্করণ আণবিক বোমা হাতে করিয়া নির্ব্বিচারে নরনারী হত্যা, পুর-গ্রামের ধ্বংস সাধনই মানবের চরম ও পরম লক্ষ্য নহে। ইহা পুরুষার্থ নহে, ইহা শ্রেয়ঃ লাভের ও পন্থা নহে। অথচ শ্রেয়ঃ লাভই পুরুষার্থ, শ্রেয়ঃ লাভই মনুষ্যত্ব, শ্রেয়ঃ লাভই মানবের একমাত্র কাম্য। মহাপ্রভু মানবকে এই শ্রেয়ঃ লাভের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা, নিশ্চিত পন্থা, অবলম্বনীয় পন্থারই সন্ধান দিয়া গিয়াছেন।

মহাপ্রভুর অনুবর্ত্তী আচার্য্যগণ অত্যন্ত কুশলতার সহিত বৈষ্ণব সাধনার প্রস্থানত্রয় নির্ণয় করিয়াছেন প্রথম দুই প্রস্থানের তাঁহারা ইঙ্গিত মাত্র দিয়াছেন, কয়েকটী মাত্র কথা সঙ্কেতে বলিয়াছেন। তাঁহারা এই প্রস্থানত্রয়ের নাম দিয়াছেন—সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা। সঙ্কেতে বলিতে পারি অভিধা লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা। এই তিন পথের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম ভূ, শ্রী, ও লীলা।

অসুরাক্রান্তা পৃথিবী, ভূশক্তি কংসরাজ্যে বন্দিনী, তাই তিনি কুব্জা। যিনি রাজ্যেশ্বর হন, তিনিই পৃথিবী ভোগ করেন তাই তিনি মথুরায় পণ্যাস্ত্রী। কংসকে উদ্বর্ত্তন অনুলেপন দানই তাঁহার নিত্য কর্ম্ম। কংসের ধনুর্যজ্ঞে আমন্ত্রিত হইয়া বলদেব সহ শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় আসিয়াছেন। কিন্তু পুরবাসিগণ নীরব। মহাসত্য যেদিন মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক দুষ্কৃতিবিনাশে অগ্রবর্ত্তী হইয়া রাজপথে দাঁড়াইয়া উচ্চারণ করেন "অয়মহং ভো" আমি আসিয়াছি। সেদিন তাঁহাকে বরণ করিবার সামর্থ্য থাকে কয়জনের? অন্তরে কৃষ্ণানুরক্তি রহিয়াছে, কিন্তু বাহিরে তাহা প্রকাশ করিবার উপায় নাই। বিধি ও শৃঙ্খলা রক্ষার নামে কণ্ঠ তাহাদের অবরুদ্ধ। পুরবাসিগণের যখন এই অবস্থা, তখন এই বারনারী, এই কুব্জা আসিয়া কৃষ্ণকে বরণ করিলেন। বলিলেন, আমায় গ্রহণ কর, আমি তোমার। প্রকাশ্য রাজপথে উন্মুক্ত দিবালোকে কংসের রাজধানীতে দাঁড়াইয়া অবলীলাক্রমে তিনি কংসকে উপেক্ষা করিলেন। কংস কৃপণ, কংস অধার্ম্মিক, ইন্দ্রিয়ারাম।

কংস অর্থে আত্মসুখ, অত্যন্ত ঘৃণিত উপায়ে মহদতিক্রম করিয়াও আত্মস্বার্থ সংরক্ষণই তাহার স্বভাবধর্ম্ম। কুব্জা এই কংসের শত্রু, সেই মহাসত্যকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইলেন। হৃদয়-সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে প্রাণে বরণ করিয়া লইলেন। বাঙ্গালার তরুণ-তরুণীগণকে আমি এই সাধন গ্রহণে আহ্বান করিতেছি। ভাগবতধর্ম্ম সাধনার ইহাই নিম্নতম সোপান। নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলেরই এই মন্ত্র গ্রহণের অধিকার আছে। ইহার নাম সাধারণী। কিন্তু অসাধারণত্ব ইহার সর্ব্বাঙ্গে। এইজন্য অতি সাবধানে এ মন্ত্রের সাধনা করিতে হয়। পূজোপকরণে অস্ত্র-শস্ত্রের কোন বালাই নাই, সৈন্য-সামন্তের কোন আবশ্যকতা নাই। ধূপ-দীপ নৈবেদ্যের আড়ম্বর নাই। ইহার সাধনমন্ত্র "তবৈবাহং"।

দ্বিতীয় সাধন মন্ত্রের নাম "মমৈবাসৌ", চলিত কথায় এই মন্ত্রের মর্ম্মকথা "তুমি আমার", সমঞ্জসার ইহাই সাধন। এই পথের পরিচয় জানিতে হইলে আমাদিগকে একবার বিদর্ভের রাজধানীতে যাইতে হইবে। এক অনূঢ়া কিশোরী রাজকন্যা, নাম রুক্মিণী, ইহারই বিবাহ। রাজ্যে মহা উৎসব, পুরবাসিগণ পরমানন্দিত। ভ্রাতা রুক্মী বিবাহের সম্বন্ধ করিয়াছেন, জরাসন্ধ সহায়ে পরাক্রান্ত শিশুপাল বরবেশে রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। রুক্মিণী কিন্তু অন্যপূর্ব্বা, তিনি পূর্ব্বেই মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। এখন এই মহান বিপত্তি হইতে উদ্ধারের উপায় কি? রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের নিকট একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রখানির ভাষা এইরূপ -

'হে ভুবনসুন্দর, হে অচ্যুত, হে প্রিয়, আপনার গুণ ও রূপের কথা শুনিয়া আমার চিত্ত আপনাতেই আসক্ত হইয়াছে।

হে মুকুন্দ, কুল-শীল, রূপ গুণ, বিদ্যা নবযৌবন, শোভা সম্পদ ও প্রভাবে আপনিই আপনার সমতুল্য। হে নরোত্তম, হে লোকনয়নাভিরাম, কোন্ ধীরা কুলকন্যা আপনাকে পতিত্বে বরণ না করিতে চায়?

আমি আপনাকে পতিত্বে বরণপূর্ব্বক আত্মসমর্পণ করিয়াছি। আপনি বিদর্ভে আসিয়া আমাকে গ্রহণ করুন। যেন সিংহের ভোগ্য শৃগালে অপহরণ না করে, যাহা বীরেন্দ্র-বাঞ্ছিত, তাহা যেন শিশুপাল স্পর্শ করিতে না পারে।

আমি যদি ইষ্টাপূর্ত্ত ও ব্রতনিয়মাদির দ্বারা ভগবান নারায়ণের উপাসনা করিয়া থাকি, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া আমার পাণিগ্রহণ করিবেন, শিশুপালাদি রাজগণ আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

শ্বো ভাবিনি ত্বমজিতোদ্বহনে বিদর্ভান্
গুপ্তঃ সমেত্য পৃতনা পতিভিঃ পরীতঃ।

নির্ম্মথ্য চৈদ্যমগধেন্দ্রবলং প্রসহ্য
মাং রাক্ষসেন বিধিনোদ্বহ বীর্য্যশুল্কাম।

ওগো অজিত আপনি গুপ্তভাবে বিদর্ভে আগমন করুন। কিন্তু একাকী নহে, আসিবেন আপনার অপরাজেয় যাদব সৈন্য এবং সেনাপতিগণকে সঙ্গে লইয়া। আসুন, আসিয়া শিশুপাল ও জরাসন্ধের সৈন্যবল মথিত করিয়া বীর্য্যশুল্কা আমাকে রাক্ষসাবধি অনুসারে বিবাহ করুন।

যদি জিজ্ঞাসা করেন, আমার আত্মীয়গণকে হত্যা না করিয়া অন্তঃপুরচারিণী আমাকে কিরূপে গ্রহণ করিবেন? তাহারও উপায় নিবেদন করিতেছি। চিরপ্রথানুসারে বিবাহের পূর্ব্ব দিন আমাদের কুলদেবযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সে দিন অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া নববধূকে ভবানীমন্দিরে গমন করিতে হয়। আপনি সেইখানেই আমাকে হরণ করিবেন।"

শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর এই প্রার্থনা পূরণ করিয়াছিলেন। তিনি কুণ্ডীন নগরে আসিয়া রক্ষিপরিবৃতা রুক্মিণীকে হরণ করিয়াছিলেন। সম্মুখ যুদ্ধে সৈন্যবল সহ জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। রুক্মিণী যেমন আপনার কুলধর্ম্ম, ক্ষত্রিয় কন্যার ধর্ম্ম আচরণ করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণও তেমনই রুক্মিণীর কুলধর্ম্মকে স্বীকার করিয়াই তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে যুদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য, এমন কি আত্মরক্ষার্থে স্থলবিশেষে আক্রমণও একান্ত প্রয়োজনীয়। ভাগবতধর্ম্মে কখনও এ কথা অস্বীকৃত হয় নাই। যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের অবশ্যপালনীয় স্বধর্ম্ম। পৌরাণিককালে অধিকাংশ যুদ্ধই ধর্ম্মযুদ্ধ ছিল, যুদ্ধের একটা মানবধর্ম্মানুমোদিত রীতি পদ্ধতি ছিল, নিয়ম-শৃঙ্খলা ছিল। ভাগবতধর্ম্ম ধর্ম্মযুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে উপদেশ দেন না।

তৃতীয় প্রস্থানের কথাই মহাপ্রভু বিশদ রূপে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই পথের সাধনমন্ত্র 'স এবাহং" "আমিই সেই" "আমিই তুমি"। কিন্তু ইহা অহংগ্রহ উপাসনা নহে, অহংকৃতের সোঽহং নহে। অভাবের অপূর্ব্ব তন্ময়তায় এই ভাব স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, ভাব না থাকিলে অভাব বোধ জাগ্রত করিবে কে? এই ভাবের চিত্রই কবি জয়দেব অঙ্কিত করিয়াছেন—

মুহুরবলোকনমণ্ডন লীলা।
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা॥

এই ভাবের নাম সমর্থা। অত্যুচ্চ প্রাকার, অপার সাগর, দুরারোহ পর্ব্বত ইহার গতিরোধ করিতে পারে না। বেদধর্ম্ম, সমাজধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম ইহাকে বন্দিনী করিয়া রাখিতে পারে না। কোন পদ পদার্থই ইহাকে প্রকাশ করিতে

পারে না। "পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা যুগ যুগ ধাবিত যাত্রীগণের" অগ্রবর্ত্তিনী পথপ্রদর্শিকারূপে সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে এই সর্ব্বত্যাগিনীরা দুর দুর্গম পথে অভিসার করিয়া মানবকে অভীষ্ট দান করিয়াছে।

বৈষ্ণবের সাধন পথের,—সে যে পথই হোক না, অন্যতম পাথেয় হইল ত্যাগ। সর্ব্বস্ব ত্যাগ না করিলে এই পথে প্রথম পদক্ষেপেরও অধিকার পাওয়া যায় না। দেশের জন্যই হোক, আর জাতির জন্যই হোক, অভীষ্টলাভের "নান্য পন্থা বিদ্যত অয়নায়।" আনন্দই মানুষকে সর্ব্বত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে। সমর্থাই এই আনন্দ রাজ্যের রাজরাজেশ্বরী।

নিম্মৎসর সৎ প্রকৃতি, বলিষ্ঠ একনিষ্ঠ মতি, প্রসন্ন উজ্জ্বল চিত্ত এবং প্রোজ্‌-ঝিত-কৈতব প্রাণ ভিন্ন বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সাধনের যোগ্যতা অর্জ্জিত হয় না। এ দেশে একটা কথা আছে, বেদ প্রভু, পুরাণ ও তন্ত্র মিত্র, কাব্য প্রেয়সী। শ্রীমদ্ভাগবতে এই তিন ভাবেরই সমন্বয় ঘটিয়াছে। বেদের কর্ম্মকাণ্ডের পর বুদ্ধদেব নীতি ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। অতঃপর শংকরের জ্ঞানবাদ এবং আচার্য্য রামানুজাদি প্রবর্ত্তিত ভক্তিবাদ প্রচারের পর মহাপ্রভু মানবতার কথা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবত কর্ম্ম, নীতি, জ্ঞান ভক্তি ও মানবতার শাস্ত্রগ্রন্থ। মহাপ্রভুই শ্রীমদ্ভাগবতের বাণীবিগ্রহ, মহাপ্রভুই মানবতার পরিপূর্ণ প্রতিরূপ। মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত সাধনা—মানবতার সাধনা। এই সাধনাকে জীবনে সত্য করিতে হইবে, সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে। এই জীবনকে ভাগবত জীবনে রূপান্তরিত করিতে পারিলেই সিদ্ধি করতলগত হইবে। "তোমার যে অন্য মন আমার মন বৃন্দাবন"—এই মনে বনের ঐক্যসাধনই সর্ব্বার্থসিদ্ধির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। এই জন্যই মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। বিশ্বমানবের একমাত্র গন্তব্য স্থান মধুর ভূমি শ্রীবৃন্দাবন। ভূমি সেখানে চিন্তামণিময়, জল অমৃত। বৃক্ষ কল্পবৃক্ষ, লতা কল্পলতা। ধেনু কামধেনু, কথা গান, গমনই নৃত্য। ভূমি চিন্তামণিময়, বৃক্ষ কল্পবৃক্ষ, কিন্তু এখানে কাহারো কোন প্রার্থনা নাই। কামনা আছে, এক মাত্র কৃষ্ণ সুখের কামনা।

কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

বৃন্দাবনে সাহজিক যে সম্পদ সিন্ধু।
দ্বারকা বৈকুণ্ঠ সম্পদ্ তার এক বিন্দু॥
পরম পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান।
কৃষ্ণ যাহা ধনী তাঁহা বৃন্দাবন ধাম॥

চিন্তামণিময় ভূমি রত্নের ভবন।
চিন্তামণিগণ দাসী চরণ ভূষণ॥
কল্পবৃক্ষ লতা যাঁহা সাহজিক বন।
পুষ্প ফল বিনা কেহ না মাগে অন্য ধন॥
অনন্ত কামধেনু যাঁহা চরে বনে বনে।
দুগ্ধমাত্র দেন কেহ না মাগে অন্য ধনে॥
সহজ লোকের কথা যাঁহা দিব্য গীত।
সহজ গমন করে নৃত্য পরতীত॥
সর্বত্র জল যাঁহা অমৃত সমান।
চিদানন্দ জ্যোতি স্বাদ্য যাঁহা মূর্ত্তিমান্॥
লক্ষ্মী জিনি গুণ যাহা লক্ষ্মীর সমাজ।
কৃষ্ণ বংশী করে যাঁহা প্রিয় সখী কাজ॥

এই মধুর বৃন্দাবনের নায়ক রসস্বরূপ, তিনি ভুবনসুন্দর, তিনি চিরকিশোর, বংশী তাহার প্রিয়সখী। এই প্রেমরাজ্যের যিনি সর্ব্বেশ্বরী, যিনি নায়িকা, তিনি মহাভাবময়ী, তিনি সর্ব্বসৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী, তিনি চির কিশোরী, বিভাবাদি তাঁহার প্রিয় সখী! বৈষ্ণব সাধক এই রসস্বরূপ ও মহাভাবময়ীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, রসভাবের অপরোক্ষানুভূতি লাভে ধন্য হইয়াছিলেন।

এই ভাবরসের পরিপূর্ণ রূপ বাঙ্গালার নিজস্ব সম্পদ। বাঙ্গালার ব্রজভূমি নবদ্বীপ এই ভাবরস বিগ্রহের পদস্পর্শে ধন্য হইয়াছিল। এমনই এক দুর্দ্দিনে বাঙ্গালার অন্ধকারাচ্ছন্ন অদৃষ্টাকাশে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র উদিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী তাঁহাকে রসরাজ মহাভাব রূপেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। নূতন বাঙ্গালার মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি তাঁহার প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন—

রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ হ্লাদিনী শক্তিরস্মা
দেকাত্মানাবপি ভুবিপুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমিকৃষ্ণস্বরূপং॥

যাঁহাদের কৃপায় এই মহাভাব বিভাবিত রসস্বরূপের দিব্যানুভূতি লাভের সৌভাগ্য ঘটে, আমি সেই বিভাব অনুভাব স্বরূপিণী ব্রজগোপীগণকে বন্দনা করি।

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্নশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্।

উপনিষদে পঞ্চবিধা মুক্তির তিনটি

শ্রীমদ্‌ভাগবতে পঞ্চবিধা মুক্তির কথা আছে। শ্রীভগবান বলিয়াছেন —আমার যাহারা একান্ত ভক্ত, তাহাদিগকে সার্ষ্টি, সালোক্য ও সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্যদান করিলেও তাহারা আমার সেবা ভিন্ন এই পঞ্চবিধা মুক্তি গ্রহণ করে না।

আমি বহুবার বলিয়াছি এই পঞ্চবিধা মুক্তি অর্জন করিতে না পারিলে অন্য কোনও উপায়েই জাতি গঠন করা যায় না। কতকগুলি মানুষকে একটি জাতিরূপে সুগঠিত করিতে হইলে অবশ্যই এই পঞ্চবিধা মুক্তি করায়ত্ত করিতে হইবে।

সার্ষ্টি - সমান ঐশ্বর্য। বর্তমান সমাজে সকলেরই সমান ঐশ্বর্য থাকে না। অথচ অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় না হইলে অন্য কোন বুনিয়াদের উপর জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করা চলে না। এইজন্যই সমাজে এমন একটা স্বাভাবিক প্রণালী থাকা চাই, যে প্রণালীপথে সকলেই আপন আপন সামর্থ্য ও শ্রমের বিনিময়ে যথাযোগ্য অর্থ উপার্জনের সুযোগ প্রাপ্ত হইতে পারেন। আজ যদি সমাজের সকলের অর্থ লুণ্ঠন করিয়া প্রত্যেককে সমান অংশে বণ্টন করিয়া দেওয়া যায়, দশ দিন পরে আবার লুণ্ঠন ও বণ্টনের আবশ্যকতা দেখা দিবে। কারণ, প্রতিটি মানুষের খরচের খবরদারী অসম্ভব ব্যাপার। কে কখন জুয়ায়, মদের নেশায়, লাম্পট্যে বা অন্য পথে অমিত ব্যয়ে অপব্যয়ে সর্বস্বান্ত হইবে স্বয়ং গণকও গণনা করিয়া বলিতে পারিবেন না। সমাজে বৃত্তি-সাঙ্কর্য ঘটিয়াছে। চাকুরী মিলিতেছে না। দুর্নীতি সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম কুসংস্কারের রূপান্তররূপে প্রচারিত হইতেছে স্বজাতি-প্রীতি, প্রতিবেশীস্নেহ, স্বজন সৌহার্দ্য বিলুপ্ত প্রায়। বহু সমস্যার মধ্যে সর্বাগ্রে আমাদিগকে অর্থনৈতিক সমস্যারই সমাধান করিতে হইবে।

সালোক্য—সমান লোকে বাস চাই। ভৌগোলিক ঐক্য চাই। পূর্বকালে এই সমস্যার সমাধানের জন্য তীর্থের সৃষ্টি হইয়াছিল। সেতুবন্ধ হইতে চট্টগ্রাম—হিংলাজ হইতে কামরূপ মানুষের অবশ্য দ্রষ্টব্য ও গন্তব্য স্থানরূপে গণ্য হইত। শিরো গয়া, নাভি গয়া, পাদ গয়া— পিতৃপুরুষকে স্মরণ করিবার, সর্বদেশের মানুষকে একত্রে মিলাইবার এমন ক্ষেত্র ছিল অসংখ্য। সামীপ্যের সমাধান করিত মেলাগুলি। সামীপ্যের সমাধান হইত বিবিধ উৎসবে পার্বণে—স্বজনসমাবেশে, ভিন্নজাতির বহু

নরনারীর সমাগমে। আমন্ত্রিত—অনাহূত রবাহূত সকলেরই স্থান হইত অন্নপ্রাশনাদি উৎসবে।

সারূপ্য—পাঁচটি আঙ্গুলই যখন এক হাতেই, অসমান, তখন মানুষের মধ্যে সমানরূপ কোথায় পাইব! এইজন্যই সম্প্রদায়গত বিশেষ চিহ্নধারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছিল। মহাত্মা গান্ধী এই রহস্য জানিতেন। তাই মানুষকে চরকা কাটিতে বলিয়াছিলেন।

সাযুজ্য—এক ভাষা চাই। তাই বলিয়া ভাষাভিত্তিক রাজ্য গড়িয়া ভারতকে খণ্ড-বিখণ্ড করিতে হইবে না কি? যে যেখানে থাক মাতৃভাষার চর্চা কর, আর সারা ভারতে একটা সার্বজনীন ভাষা চালু রাখ, তাহাতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

এই পঞ্চবিধা মুক্তির মধ্যে তিনটির কথা উপনিষদে পাইতেছি। হিঙ্কার, প্রস্তাব, উদ্গীথ, প্রতিহার এবং নিধন এই পাঁচটি উপনিষদের গূঢ়ার্থ ব্যঞ্জক পরিভাষা। ছান্দোগ্য উপনিষদে দ্বিতীয় অধ্যায়ে কয়েকটি সাম-উপাসনার কথা আছে। উদাহরণস্বরূপ বামদেব্য সামের উল্লেখ করিতেছি।

উপমন্ত্রণ—রমণীকে সঙ্কেত হিঙ্কার। তোষণ প্রস্তাব, এক শয্যায় শয়ন উদ্গীথ, অভিমুখে শয়ন প্রতিহার, কালক্ষেপন্ নিধন, কৃতার্থতাও নিধন। এই বামদেব্য সাম মিথুনে প্রতিষ্ঠিত। ন কাঞ্চন পরিহরেৎ তদ্‌ব্রতম্। তন্ত্রের কৌলাচারের যজ্ঞে উপবেশনের সঙ্গে ইহার বাহ্যিক সাদৃশ্য আছে। প্রসঙ্গত ইহার উল্লেখ করিলাম।

ছন্দোগ্যের বিংশ খণ্ড দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাইতেছি—অগ্নি হিঙ্কার, বায়ু প্রস্তাব, আদিত্য উদ্গীথ, নক্ষত্র প্রতিহার, চন্দ্রমা নিধন। এই রাজন সাম দেবতাগণে প্রতিষ্ঠিত।

> স য এব মেতদ্রাজনং দেবতাস্থ
> প্রোতং বেদৈতাসামেব দেবতানা
> সলোকতা, শষ্টতা, সাযুজ্যং
> গচ্ছতি সর্ব্বং মায়ুরেতি
> জ্যোগ জীবতি মহান
> প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্
> কীর্ত্ত্যা। ব্রাহ্মণোন্ ন নিন্দেৎ
> তদ্‌ব্রতম্॥

যিনি এই রাজন্ নামক সামকে দেবতাসমূহে প্রতিষ্ঠিত জানেন, তিনি উক্ত

দেবতাগণের সমান লোকে অবস্থিতি, সমান অধিকার প্রাপ্তি. (ভাষ্যানুবাদে সমান সম্পত্তির অধিকার বলা হইয়াছে। সমান ঐশ্বর্যই ইহার অর্থ।) এবং সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকেন। সমগ্র আয়ু প্রাপ্ত হন, উজ্জ্বল জীবন ধারণ করেন, সন্তান ও পশু সম্পদে মহান হন, কীর্তি দ্বারাও মহান হন। ব্রাহ্মণগণকে নিন্দা করিবে না, ইহাই তাহার ব্রত।

দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয়—পাদ-টীকায় লিখিয়াছেন—(২০৮ পৃঃ) 'তাৎপর্য—শ্রুতিতে সলোকতা প্রভৃতি শব্দগুলির পরে 'বা' শব্দ নাই সত্য। কিন্তু ভাষ্যকার বলিতেছেন—যে সলোকতা সার্ষ্টিতা ও সাযুজ্য এই তিনটি ফলই যখন সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার, তখন বুঝিতে হইবে, একই প্রকার উপাসনায় উক্ত ত্রিবিধ ফল সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে উপাসনাগত উৎকর্ষাপকর্ষ এইরূপ ফলভেদের একমাত্র কারণ। উপাসনার তারতম্য অনুসারেই—ঐ তিনের মধ্যে যে কোন একটি ফল লাভ করা হয়। বিশেষতঃ এই তিনটি ফল এক ব্যক্তির নিকট একই কালে কখনই ভোগযোগ্য হইতে পারে না। কারণ উহারা বিভিন্ন প্রকার।

কাজেই একটি 'বা' শব্দ দিয়া এই বিরোধ পরিহার করিতে হইবে। যে যেরূপ উপাসনা করিবে তাহার পক্ষে এই তিনটির একটি ফললাভ হইবে। সমস্তগুলি নহে।"

উপনিষদের সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের পার্থক্য এই যে—শ্রীকৃষ্ণের সখ্যগণ শ্রীধাম বৃন্দাবনে অতি স্বাভাবিকরূপে এই পঞ্চবিধা মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সমান ঐশ্বর্যই সখ্যগণের ছিল। তাঁহারা সমান না হইলে কখনই শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ করিতে পারিতেন না। সালোক্য সমীপ্য এবং সারূপ্যও তাঁহাদের ছিল। শ্রীকৃষ্ণ প্রতি সখার রূপ ধারণ করিয়াছিলেন ব্রহ্মমোহন লীলায়। সাযুজ্য অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্যময়-অন্তর তাঁহাদের প্রত্যেকেরই ছিল। ছিল সারা বৃন্দাবনের তরুতৃণলতাগুল্মের—স্থাবর এবং জঙ্গমের। এই পঞ্চবিধা মুক্তি সখা-গণের স্বভাবজ ছিল। নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকরগণের ইহাই বৈশিষ্ট্য। উপনিষদের সঙ্গে বৈষ্ণবগ্রন্থের ইহাই পার্থক্য।

তিনটি মুক্তির মূল পাওয়া গেল ছান্দোগ্য উপনিষদে। সামীপ্য ও সারূপ্যের ঔপনিষদিক ভিত্তি আছে কিনা অনুসন্ধান কর্তব্য। আমি এই দিকে আচার্য্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

কুরুক্ষেত্র মহাশ্মশান—অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের শবপরিকীর্ণ। চতুর্দিকে মৃত অশ্ব হস্তীর গলিত দেহ। তাহারই মাঝে মাঝে ভগ্ন রথের চূর্ণাংশ। শিবাসারমেয়দলের কোলাহল, শকুনী গৃধিনীর তাণ্ডব।

তাহারই এক পার্শ্বে রহিয়াছেন শর-শয্যা-শায়িত ক্ষত্রিয় কুলতিলক কুরুপিতামহ পরমপূজ্য ভীষ্মদেব। যৌবন হইতে মৃত্যুশয্যা—এক বিচিত্র জীবনাদর্শ। মরদেহ পরিত্যাগের জন্য উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করিতেছেন। কতিপয় প্রহরী দিক্‌ রক্ষা করিতেছে অতন্দ্র নয়নে। ধূপধূমের সুরভি দিঙ্‌মণ্ডল আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে।

ইহারই কিছু দূরে দ্বৈপায়ন হ্রদতীর। সেখানে বৃকোদরবিদ্ধ গদাভিমর্ষে ভগ্নোরুদণ্ডে ভূপতিত দুর্যোধন। আসমুদ্রহিমাচল সাম্রাজ্য নাই। একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য নাই। ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ শল্য সেনাপতি নাই। একোনশত আজ্ঞানুবর্ত্তী সহোদর নাই। যিনি ক্ষত্রধর্ম রক্ষার্থ নিশ্চিত মৃত্যু জানিয়াও সাক্ষাৎ শমন অভিমন্যুর সম্মুখে সমযোদ্ধা প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র লক্ষ্মণকে চক্রব্যূহ মধ্যে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হন নাই, তাহার পর সপ্তরথীর সাহায্য লইয়াছিলেন, যিনি দম্ভভরে পাঁচখানি মাত্র গ্রামপ্রার্থী দূতরূপী শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে উচ্চারণ করিয়াছিলেন "বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী"—সেই অভিমানী দুর্যোধন। আজ চতুর্হস্ত ভূমণ্ডল মাত্র যাঁহার সম্বল। জীবন্তে ভক্ষণাভিলাষী ক্রমাগ্রসর শৃগাল কুক্কুরকে অঙ্গুলি তাড়নে ও নিবারণে যাঁহার সামর্থ নাই।

সম্রাট দুর্যোধন যুদ্ধশেষে আসিয়া দ্বৈপায়নহ্রদ মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের কটু বাক্যে হ্রদ মধ্য হইতে উত্থিত হইয়া তিনি যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইয়াছিলেন। অন্তিম মুহূর্ত্তেও সমযোদ্ধা নির্বাচিত করিয়াছিলেন, নকুল সহদেবকে নহে, এমন কি অর্জ্জুনকেও নহে, চিরগৌরবস্পর্দ্ধী ভীমসেনকে গদাযুদ্ধে। যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণসহ দুর্যোধনের অস্ত্রশিক্ষাগুরু স্বয়ং বলদেব উপস্থিত ছিলেন।

"ত্রয়োদশ বর্ষ তীর্থ করি পর্যটন।
দ্বৈপায়নে বলদেব দিলা দরশন"॥

পুরাণপাঠক রোমহর্ষণ ব্যাসাসনে বসিয়াছিলেন। বলদেবকে দেখিয়া

গাত্রোত্থানপূর্বক অভ্যর্থনা করেন নাই। এই অপরাধে হলধর তাঁহাকে বধ করেন। সেই পাপ ক্ষালনার্থেই এই তীর্থ পর্যটন। কুরুক্ষেত্র সমর সময়ে তাই তিনি উপস্থিত ছিলেন না। গদাযুদ্ধে কটির নিম্নদেশে আঘাত নিতান্ত দোষাবহ। এই নিয়ম লঙ্ঘন করিতে দেখিয়া ভীমসেনকে তিরস্কারপূর্বক তিনি সে স্থান ত্যাগ করেন।

ভারতসম্রাট দুর্যোধনের সম্মুখে এই হ্রদতীরে দাঁড়াইয়া মানব-মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগিবে "ততঃ কিম্" ? মানব জীবনের কি এই পরিণাম ? এই সর্বাত্মক ধ্বংস এই মহতীর বিনষ্টিই কি তাহার বিধিনির্দিষ্ট নিয়তি ? ব্রহ্মাস্ত্র ও পাশুপত —পরমাণু বোমা, এ্যাটম বোমা নির্মাণই কি মানবিক শিক্ষার চরমতম ফলশ্রুতি। আত্মীয় নাই, স্বজন নাই, মমতা নাই, দয়া নাই প্রীতি নাই, ভালবাসা নাই, এই ঘৃণ্য অহংমন্যতা, হীন স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুর হিংসা, ক্রুর ঈর্ষা, বিষাক্ত বিদ্বেষই তাহার সর্বস্ব! শ্রীমদ্‌ভাগবত এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন ভাগবতধর্মই মানব ধর্ম।

শ্রীমদভাগবতের অধিষ্ঠান ভূমির পর্যালোচনা করিলে, তাহার শ্রোতা ও বক্তার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলে, যে পুণ্যক্ষেত্রে এই দিব্যবাণী বিতরিত হইয়াছিল সেই সুপবিত্র গঙ্গাতীরের প্রতি নয়নক্ষেপ করিলে স্বতঃই উপলব্ধি হইবে যে ইহার মধ্যে অশ্লীলতার নামগন্ধ নাই. অশ্রাব্য কোন প্রসঙ্গ মাত্র নাই, যাহা আছে তাহা ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ভাবুক ও রসিকজনের মুহুর্মুহু পানের অপার্থিব অমৃত।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার অনুক্রমণিকা ও গীতামাহাত্ম্য অবশ্য পাঠ্য। গীতায় যে অমৃত পরিবেশিত হইয়াছে, তাহা সর্ব উপনিষদ হইতে দোহন করা অমৃত। এই অমৃত দোহন করিয়াছেন গোপালনন্দন, নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। গোয়ালার ছেলেরই ইহা জন্মগত অধিকার।

কংস চাণুরকে মর্দন করিয়াছেন যিনি তিনি বসুদেবনন্দন দেবকীর পরমানন্দ। আর কুরুক্ষেত্র রণনদীর পারকর্তা কৈবর্ত যিনি তিনি দ্বারকাধীশ। শ্রীবৃন্দাবন মথুরা ও দ্বারকার এই কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে। আমাদিগকে সমর্থা, সাধারণী ও সমঞ্জসার গূঢ়ার্থপূর্ণ ইঙ্গিত।

গীতামাহাত্ম্যে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "গীতা মে হৃদয়ং পার্থ"। এই একটি কথাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। শ্রীকৃষ্ণহৃদয়ের অধীশ্বরী তাঁহারই স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীশক্তি আনন্দবিগ্রহ শ্রীরাধা। গীতা শ্রীরাধারই কায়ব্যূহ। ব্রজগোপীগণ গীতার জঙ্গম প্রতিমা। গীতার শ্লোকাবলী মূর্তি পরিগ্রহ

করিয়াছে ব্রজধামের তরু তৃণে লতাগুল্মে ধেনুবৎসে ময়ূরীময়ূরে কোকিলভ্রমরে শুকশারিকায় এবং গোপগোপীগণের জীবনে। গীতার আদাবন্তে যাহা কীর্ত্তিত হইয়াছে তাহা শ্রীভগবদ্ শরণাগতি; শ্রীমদ্ভাগবত তাহারই উদাহরণমূলক শাস্ত্র। গীতার যেখানে পরিসমাপ্তি, সেই স্থান হইতেই শ্রীমদ্ভাগবতের শুভারম্ভ।

আনন্দ হইতেই ভূতসকলের জন্ম, আনন্দেই স্থিতি, আনন্দেই লয়। ভালবাসা মানবের সহজাত ধর্ম। মানুষ ভালবাসিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তবে আবরিকা শক্তি মায়ার প্রভাবে কেহ ভালবাসে রমণীদেহ, কেহ ভালবাসে অর্থ যশ প্রভাব প্রতিপত্তি। এই সমস্ত ক্ষণভঙ্গুর নশ্বরের প্রতিই তাহাদের আকর্ষণ। এমন কি দুরদৃষ্টবশত কেহ হিংসাকেও ভালবাসে, ভালবাসে ক্রূরতা বিদ্বেষকে। ধীরে ধীরে ইহাদিগকে ভালবাসার মর্মকথা বুঝাইয়া দিতে হইবে। নিঃস্বার্থ ভালবাসা। এই সংসারেই ভালবাসার বর্ণপরিচয় ঘটে। তাহার পর পূর্বজন্মের পুণ্যফলে কোন মহতের সঙ্গলাভ হইলে এই ভালবাসা তাঁহাকেই অর্পণ করিবার সৌভাগ্য হয়, যিনি এই ভালবাসার সাক্ষাৎ বিগ্রহ। যাঁহাকে ভালবাসিলে অমৃতের আস্বাদ লাভ হয়, এই ভালবাসার ফলেই তাঁহাকে লাভ করা যায়—যাঁহাকে পাইলে এই সংসারে মানুষের মনে আর কোন কিছু চাওয়া পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে না, যাঁহার পদপ্রান্তে স্থান পাইলে পতনের আশঙ্কা চিরতরে অন্তর্হিত হয়, অতি বড় গুরু দুঃখও আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

এই ভালবাসা কিন্তু ক্লীবের ভালবাসা নহে, কাপুরুষের ভালবাসা নহে, দুর্বলের ভালবাসা নহে। এই ভালবাসা যাহার হৃদয়ে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, এই ভালবাসা যে বাসিতে পারিয়াছে, সে তো চির নির্ভীক। জগতে সেই তো অমিত-বীর্যবন্ত, সেই তো অক্ষয় বলশালী। পথ দুর্গম, পথ উপলসঙ্কুল, কণ্টকাকীর্ণ, বন্ধুর, কর্দ্দমাক্ত, পিচ্ছিল। কিন্তু এই পথে যে একবার অগ্রসর হইয়াছে, কোন বাধাই তাহার গতিরোধ করিতে পারে না। ভ্রমেও তাহার পদস্খলন হয় না। তাহার গতি দুর্বার, গতি অনিবার, গতি লক্ষ্যাভিমুখী। গন্তব্য স্থলে না উপস্থিত হইয়া সে গতি বিরত হয় না। ইহারই এ সমগ্রের আদর্শ শ্রীব্রজধাম।

আমাদিগকে কায়মনোবাক্যে ব্রজবাসী হইতে হইবে। সুদৃঢ় নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রজবাসীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে হইবে। নিঃশঙ্ক চিত্তে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসিতে হইবে। ব্যক্তিকে জাতিকে স্বজন পরজনকে প্রতিবেশীকে গ্রামকে দেশকে ভালবাসিয়া সেই ভালবাসা বিদেশেও বিলাইতে হইবে। ইহাই মানব ধর্ম।

রাব তোমাকে বাঁচাইতে পারিবে না। যদি বাঁচিতে চাও মন্দির-অঙ্গনতলে সমবেত হও। এই সর্বনাশা আত্ম-সর্বস্ব বৈদেশিক সভ্যতা দূরে পরিহার কর। ভারতের ঐতিহ্য, ভারতের পূর্ব গৌরব স্মরণপূর্বক ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধারার অনুসরণ কর। পৃথিবী হইতে নীতি ধর্ম অন্তর্হিত হইয়াছে। মানুষ এতই স্বার্থান্ধ হইয়াছে যে উদ্বৃত্ত খাদ্য নষ্ট করিয়া ফেলিবে, তথাপি লোক-কল্যাণে তাহা বিতরণ করিবে না। যে বিজ্ঞানের বলে লোক চাঁদের পিঠে পাদচারণা করে সে বিজ্ঞান কই পৃথিবীর লোকসংখ্যাবৃদ্ধি রোধ করিতে পারিতেছে না? মানবের খাদ্যাভাব দূরীকরণে সমর্থ হইতেছে না?

ভাগবতধর্মই মানবধর্ম। মানুষকে এই ধর্মেরই অনুশীলন করিতে হইবে। চীন রাশিয়া মার্কিনের ব্যাজ কাপট্যের স্বরূপ যেদিন উদ্‌ঘাটিত হইবে, লোক-ক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধ মহাকালের কবল হইতে সেদিন কেহই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। মানবের সেদিনের একমাত্র ধারক, সুহৃদ্ ত্রাণকর্ত্তা এই ভাগবতধর্ম।

খুব বেশী দিনের কথা নহে। এই ধর্ম ও ভালবাসার এই বাণী প্রচারের জন্যই এক বাঙ্গালা যুবক গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। ইঁহার শ্রবণমঙ্গল পুণ্য নাম ভারতপথিক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, বাঙ্গালার শ্রীগৌরাঙ্গ, নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিত। পরিপূর্ণ যৌবনেই স্নেহময়ী স্থবিরা জননী, প্রেমময়ী যুবতী ভার্যা, নবদ্বীপবাসী অনুরক্ত স্বজন সকলকেই পরিত্যাগপূর্বক সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন নিমাই পণ্ডিত। এই সন্ন্যাসী উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন, "নীচ জাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য"। গীতার মহাবাণী ইনি সত্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। সুদুরাচার হইয়াও যদি অনন্যভাক্ হইয়া কেহ শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করেন তিনিই সাধু, বুঝিতে হইবে তাঁহার বুদ্ধি সম্যক ব্যবসিত, জীবন ধন্য। জগাই মাধাইকে উদ্ধার পূর্বক তিনি গীতার এই মহাবাণীর সার্থক উদাহরণ লোকচক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন। সুলতান হুসেন সাহের স্পৃষ্ট জলকণা সুবুদ্ধি রায়ের ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়াছিল। এই অপরাধে তাঁহার জাতি নষ্ট হয় সেকালের প্রথায়। কাশীধামের ভারতমান্য পণ্ডিতসমাজের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সুবুদ্ধি রায়কে বলিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—

এক কৃষ্ণ নামে তোমার সর্ব পাপ যাবে।
আর কৃষ্ণ নামে পদে প্রেম উপজিবে॥

তোমার জাতি নষ্ট হয় নাই। তুমি শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া বাস কর।

অজিত চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত চয়নিকায় 'পতিতা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের এই দুই ছত্র কবিতা ছিল—

মন্ত্রী আবার সেই বাঁকা হাসি
না হয় দেবতা আম্মাতে নেই।
ছেড়েছি ধরম,তাব'লে ধরম
ছেড়েছে কি মোরে একেবারেই॥

আমরা ধর্মকে ছাড়িলেও ধর্ম আমাদিগকে ধরিয়া থাকেন। আর ধরিয়া থাকেন বলিয়াই সেই ধর্ম অনুতপ্ত হৃদয়ের আরাধনায় উদ্‌বুদ্ধ ও প্রবল হইয়া দুরাচারকে সাধু পদবীতে উন্নীত করেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু মানবের সহজাত ধর্ম এই ভালবাসাকেই জাগরিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি যে ব্রজের ভালবাসার ঋণ পরিশোধ করিতে পারেন নাই। তাই সেই ভালবাসার ঋণ মানবের পিতৃঋণ ঋষিঋণ ও দেবঋণের অতিরিক্ত চতুর্থ ঋণ আনন্দের ঋণ ভালবাসার ঋণ পরিশোধের জন্যই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মানুষ পূর্বোক্ত তিনটি ঋণের সঙ্গে এই ঋণও পরিশোধ করিতে বাধ্য। এই ভালবাসাই শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইলেই হয় পঞ্চম পুরুষার্থ প্রাপ্তি।

এই ঋণ পরিশোধিত হয় নাই। সারা পৃথিবীর মানুষকেই এই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। পৃথিবীর অগ্রজন্মা ভারতের নরনারীকেই এই জন্য অগ্রসর হইয়া আসিতে হইবে। বাঙ্গালার নরনারীই তাহার পথ প্রদর্শন করিবে।

গায়ত্রী রহস্য

গায়ত্রী দ্বিজাতি মাত্রেরই উপাস্য। গায়ত্রী উপসনায় মানব বিশ্ব-রহস্যের সন্ধান লাভ করিতে পারে, বিশ্বের সঙ্গে আপনার ঐক্য অনুভব করিতে পারে, আপনার বন্ধন মুক্তির উপায় প্রত্যক্ষ করিতে পারে। শাস্ত্র বলিতেছেন—

যা সন্ধ্যা সাতু গায়ত্রী দ্বিধা ভূত্বা প্রতিষ্ঠিতা।
সন্ধ্যারুপাসিতা যেন তেন বিষ্ণুরুপাসিতা॥

কিন্তু তাই বলিয়া গায়ত্রীর মধ্যে কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতা নাই। গায়ত্রী বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য সকল সম্প্রদায়েরই উপাস্যা। অগ্রজন্মা ভারতের আর্য্য সন্তানগণ স্মরণাতীত কাল হইতে কৈশোরে জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সাবিত্রী দীক্ষা লাভ কবিতেন, গায়ত্রীজ্ঞান ভিন্ন বেদপাঠের অধিকার জন্মিত না। গায়ত্রীই বেদমাতা, তিনিই মানবকে দ্বিজত্বের অধিকার দান করিতেন। মানব মাত্রেই শাক্ত, সকলেই শক্তির উপাসক। বিশেষ করিয়া দ্বিজাতিগণ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন—

শাক্তা এব দ্বিজাঃ সর্ব্বে ন শৈব ন চ বৈষ্ণবাঃ।
উপাসন্তে যতো দেবীং গায়ত্রীং বেদমাতরম্॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইঁহারা কেহই বৈষ্ণব বা শৈব নহেন, সকলেই শাক্ত। কারণ সকলেই বেদজননী গায়ত্রী দেবীর উপাসনা করেন।

প্রভাতে এই গায়ত্রী কুমারী, হংসবাহনাসীনা, ব্রহ্মাণী, অরুণবর্ণা, দ্বিভূজা অক্ষসূত্র কমণ্ডলুকরা, সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থা এবং ঋগ্বেদের অধিষ্ঠাত্রী। মধ্যাহ্নে ইঁহার নাম সাবিত্রী—গরুড়াসীনা, যুবতী, নীলোৎপল দলশ্যামা, চতুর্ভুজা শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারিণী, বৈষ্ণবী সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থিতা যজুর্ব্বেদের অধিষ্ঠাত্রী। সায়াহ্নে সরস্বতী শ্বেতবর্ণা বৃদ্ধা বৃষভানল সংস্থিতা, ত্রিলোচনা চন্দ্রার্দ্ধধারিণী ত্রিলোচনা দ্বিভূজা ত্রিশূল ডমরুকরা রুদ্রাণী সূর্য্যমণ্ডল মধ্যস্থা সামবেদের অধিষ্ঠাত্রী। মতান্তরে গায়ত্রী রক্তবর্ণা, সাবিত্রী শুভ্রবর্ণা, সরস্বতী কৃষ্ণবর্ণা। যাহা হউক, এই গায়ত্রী ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশের শক্তিরূপিণী ইহা নিশ্চিত। গায়ত্রী উপাসনায় প্রাণায়ামের সময় পূরক, কুম্ভক ও রেচকে নাভিদেশে ব্রহ্মা, হৃদয়ে

বিষ্ণু ও ললাটে মহেশ্বরের চিন্তা করিতে হয়। বেদভেদে নাভিদেশে বিষ্ণু, হৃদয়ে ব্রহ্মা ও ললাটে মহেশ্বরের ধ্যান করিবার বিধি দেখিতে পাই।

একটি ছন্দের নাম গায়ত্রী। পূর্ব্বে সকল ছন্দেরই চারি চারি অক্ষর ছিল। এখন কিন্তু গায়ত্রীর আট অক্ষর, ত্রিষ্টুভের এগার অক্ষর এবং জগতীর বার অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিরোধ পরিহার জন্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণে একটি উপাখ্যান কথিত হইয়াছে। আমরা ছন্দরূপা গায়ত্রীর সেই উপাখ্যানভাগ বিবৃত করিতেছি।

পুরাকালে রাজা সোম ঐ স্বর্গলোকে ছিলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ তাঁহার বিষয়ে চিন্তা করিলেন—এই রাজা সোম কিরূপে ওখান হইতে আসিবেন। তাঁহারা বলিলেন, অহে ছন্দসকল, তোমরা এই রাজা সোমকে আমাদের নিকট আহরণ কর। তাহাই করিব বলিয়া সেই ছন্দেরা সুপর্ণ হইয়া উপরে উত্থিত হইল। তাহারা যে সুপর্ণ হইয়া উপরে উঠিয়াছিল, সেইজন্য আখ্যানবিদেরা এই আখ্যানকে সৌপর্ণ আখ্যান বলিয়া থাকেন। ছন্দেরা সেই রাজা সোমকে আনিবার জন্য চলিয়াছে। সেকালে ছন্দেরা চারি চারি অক্ষরযুক্ত ছিল। তন্মধ্যে চতুরাক্ষরা জগতী প্রথমে উর্দ্ধে উঠিলেন। তখন তিনি উঠিয়া অর্দ্ধপথ গিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি তিন অক্ষর পরিত্যাগ করিয়া একাক্ষরা হইয়া দীক্ষাকে ও তপস্যাকে আহরণ করিয়া পুনরায় নামিয়া আসিলেন। সেই হেতু যাহার পশু আছে, সেই ব্যক্তিই দীক্ষালাভ করিয়াছে, তপস্যালাভ করিয়াছে; কেননা পশুগণ জগতী সম্বন্ধী এবং জগতীই তাহাদিগকে আনিয়াছিলেন।

অনন্তর ত্রিষ্টুভ উপরে উঠিলেন। তিনিও উঠিযা অর্দ্ধপথ গিয়া শ্রান্ত হইলেন। তখন তিনি এক অক্ষর পরিত্যাগ করিয়া ত্র্যক্ষরা হইয়া দক্ষিণা আহরণ করিয়া পুনরায় নীচে নামিয়া আসিলেন। ত্রিষ্টুভ দ্বারা দক্ষিণা আনীত হইয়াছিল। সেইজন্য ঋত্বিকেরাও মাধ্যন্দিন সবনে ত্রিষ্টুভের স্থানেই যজমানদত্ত দক্ষিণা আনয়ন করেন।

সেই দেবগণ গায়ত্রীকে বলিলেন, তুমি আমাদের নিকট ঐ সোমকে আনয়ন কর। গায়ত্রী বলিলেন, তাহাই করিব; তবে তোমরা আমাকে সকল স্বস্ত্যয়ন দ্বারা অনুমন্ত্রিত কর। দেবগণ, তাহাই হউক, ইহা বলিলে তিনি উর্দ্ধে উঠিলেন, দেবগণ তাঁহাকে প্র শব্দ ও আ শব্দ এই দুই মন্ত্রে সকল স্বস্ত্যয়ন দ্বারা অনুমন্ত্রণ করিলেন। এই যে প্র ও আ শব্দ ইহাই সকল স্বস্ত্যয়ন। সে জন্য যে ব্যক্তি প্রিয় হয়, তাহাকে প্র ও আ এই মন্ত্রে অনুমন্ত্রণ করিবে। তাহা

হইলে সে স্বস্তিতেই গমন করিবে ও স্বস্তিতেই আগমন করিবে। সেই গায়ত্রী উঠিয়া সোম রক্ষকগণকে ভয় দেখাইয়া পদদ্বয় দ্বারা ও মুখ দ্বারা রাজা সোমকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করিলেন এবং অন্ত দুই ছন্দ যে কয়টি অক্ষর ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাদিগকেও দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করিলেন।

তখন কৃশানু নামক সোমরক্ষক গায়ত্রীর পশ্চাৎ বাণ মোচন করিয়া তাঁহার বাম পদের নখ ছিঁড়িয়া দিলেন। সেই নখ শল্যক (সজারু) হইল। সেইজন্য সেহ শল্যক নখের মত (তীক্ষ্ণ রোমযুক্ত), সেখানে যে মেদের স্রবণ হইয়াছিল, তাহাই (ছাগলাদি যজ্ঞীয় পশুর) বসা হইল ও সেই জন্যই তাহা হব্যস্বরূপ হইল। (কৃশানু নিক্ষিপ্ত) বাণের যে অনীক (লৌহ নির্মিত শল্য ভাগ) তাহা নির্দংশী (দংশনাসমর্থ সর্প) হইল। তাহার বেগ হইতে স্বজ (দ্বিশিরা সর্প) হইল। (সেই বাণের) যে পত্র ছিল, তাহা মন্থাবল (বৃক্ষশাখায় অধোমুখে লম্বমান জীব বিশেষ) হইল। যে স্নায়ু ছিল, তাহা গণ্ডুপদ (সর্পাকৃতি জীব) হইল। যে তেজন (বাণের কাষ্ঠ ভাগ) তাহা অন্ধ সর্প হইল। এইরূপে সেই সেই জন্তু হইল।

সেই অপর দুইটি ছন্দ (ত্রিষ্টুভ ও জগতী) গায়ত্রীর নিকট আসিয়া বলিলেন, তুমি (যে চারিটি অক্ষর সোমহরণকালে) পাইয়াছে, তাহা আমাদের। সেই অক্ষর কয়টি আমাদের নিকট ফিরিয়া আসুক। গায়ত্রী বলিলেন, না আমরা যে যাহা পাইয়াছি তাহা তাহার থাকুক। তখন তাঁহারা দেবগনের নিকট প্রশ্ন উপস্থিত করিলেন। সেই দেবগণও বলিলেন, তোমাদের যে যাহা পাইয়াছ, তাহার তাহাই থাকুক। সেই হেতু এ কালেও কেহ কিছু পাইলে বলা হয়—যে তাহা পাইয়াছে তাহা তাহার। তখন গায়ত্রীর আট অক্ষর, ত্রিষ্টুভের তিন অক্ষর ও জগতীর এক অক্ষর হইল।

সেই অষ্টাক্ষরা গায়ত্রী প্রাতঃসবন নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু ত্র্যক্ষরা ত্রিষ্টুভ মাধ্যন্দিন সবন নির্ব্বাহ করিতে পারেন নাই। গায়ত্রী তাঁহাকে বলিলেন —আমি আসিতেছি, এখানে (মাধ্যন্দিন সবনে) আমারও স্থান হউক। ত্রিষ্টুভ বলিলেন, তাহাই হইবে। তবে তুমি সেই (তিন অক্ষর বিশিষ্ট) আমাকে (তোমার) আট অক্ষর দ্বারা যুক্ত কর। গায়ত্রী, তাহাই হউক, বলিয়া তাঁহাকে (আট অক্ষরে) যুক্ত করিলেন। তখন মাধ্যন্দিন সবনে সরস্বতীর শস্ত্রের যে দুই উত্তরবর্ত্তী প্রতিপৎ আর যে অনুচর আছে, তাহা গায়ত্রীকে দেওয়া হইল। ত্রিষ্টুভও একাদশাক্ষরা হইয়া মাধ্যন্দিন সবন নির্ব্বাহ করিলেন।

জগতী একাক্ষরা হইয়া তৃতীয় সবন নির্ব্বাহ করিতে পারিলেন না। গায়ত্রী

তাঁহাকে বলিলেন, আমি আসিতেছি, ইহাতে (তৃতীয় সবনে) আমার স্থান হউক। জগতী বলিলেন, তাহাই হউক তবে সেই (একাক্ষর বিশিষ্ট) আমাকে একাদশ অক্ষর দ্বারা যুক্ত কর। গায়ত্রী তাহাই হউক, বলিয়া তাঁহাকে তদ্দ্বারা যুক্ত করিলেন। তৃতীয় সবনে বৈশ্বদেব সবনের যে দুই উত্তরবর্ত্তী প্রতিপৎ আর যে অনুচর আছে, তাহা গায়ত্রীকে দেওয়া হইল। জগতীও দ্বাদশাক্ষরা হইয়া তৃতীয় সবন নির্ব্বাহ করিলেন।

সেই অবধি গায়ত্রী অষ্টাক্ষরা ত্রিষ্টুভ একাদশাক্ষরা ও জগতী দ্বাদশক্ষরা হইয়াছেন। যে ইহা জানে, সে সমান বীর্য্য ও সমান জাতি সকল ছন্দ দ্বারা সমৃদ্ধ হয়।

গায়ত্রী যে এক হইয়া ত্রিবিধ হইয়াছিলেন, সেইজন্য বলা হয়, ইনি যে এক হইয়া ত্রিবিধ হইয়াছিলেন, যে এই কথা জানে, তাহাকে (ধনাদি) দান কর্ত্তব্য।" (আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের অনুবাদ)

এই দেবী যেমন দেবতাগণের জন্য সোমাহরণ করিয়াছিলেন, আজিও তেমনই উপাসকগণকে অমৃত দান করিয়া থাকেন। প্রাতঃসবন, মাধ্যন্দিন সবন ও সায়াহ্ন সবনের স্মরণেই গায়ত্রীর ত্রিসন্ধ্যা উপাসনার বিধি এবং ইহা ব্রহ্মচার্য্য নামে অভিহিত। একা গায়ত্রী যেমন সোমাহরণের ফলে ত্রিরূপা হইয়াছিলেন, উপাসক ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী মাহেশ্বরীরূপে আজিও তাঁহার সেই ত্রিবিধ রূপেরই উপাসনা করে। এইজন্যই গায়ত্রীদেবীর আবাহনকালে তিনি—

ওঁ আয়াহি বরদে দেবী ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রী ছন্দসাং মাতঃ ব্রহ্মযোনি নমোস্তুতে॥

এই মন্ত্রে বন্দিতা হইয়া থাকেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি শাস্ত্রে দ্বিজাতি মাত্রকেই শাক্ত বলা হইয়াছে। মন্ত্রেও দেখিতে পাই কৌলগণের উদ্দেশ্যে—

অন্তে শাক্ত বহিঃশৈব সভায়াং বৈষ্ণবো মত।
নানা বেশ ধরা কৌলা বিচরন্তি মহীতলে॥

এই শ্লোক প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহার আক্ষরিক অর্থ—ভিতরে শক্তি উপাসনা, বাহিরে শৈবাচার এবং সভায় বৈষ্ণব মতবাদ অবলম্বন করিবে। ইহার অন্য অর্থ "আপন ভজন কথা, না কহিবে যথাতথা, সর্ব্বদা হইবে সাবধান" কিন্তু ইহার অপর যে গূঢ় অর্থ আছে তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ—শক্তি ভিন্ন কোন সাধনা হয় না। সেই জগজ্জননীর নিকট প্রেম ভিক্ষা করিবে। সদাশিবের মত সর্ব্বত্যাগী, যোগযুক্ত নিষ্কামকর্ম্মী হইবে। জগতের হিতে—স্বদেশ

ও স্বজাতির মঙ্গলে কর্ম্ম করিবে। ইন্দ্রিয়গণের সভায় তাহাদিগকে বৈষ্ণব-মতানুবর্ত্তী হইতে উপদেশ দিবে। "হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে" এই মহাবাণীই প্রচার করিবে। সম্প্রদায়ভেদে ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যাও প্রচলিত আছে। শাক্ত শৈব, বৈষ্ণব—কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত এইরূপ অর্থও কেহ কেহ করিয়া থাকেন। গায়ত্রীর মধ্যে এই তিনটি ভাবই সুপরিস্ফুট।

মূলে সকলেই শাক্ত। কিন্তু গায়ত্রীর উপাসনা করিলেই যে রুচিবৈচিত্র্যে অন্য দেবতার প্রতি ভক্তি করিতে বাধা দিবে ইহার কোন কারণ নাই। গায়ত্রীর মধ্যে যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান দেখিতেছি, তেমনিই ইঁহার মধ্যে পঞ্চোপাসনারও ইঙ্গিত আছে। প্রসঙ্গত একটা কথা বলিয়া রাখি। বৈষ্ণবগণ শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানিকে গায়ত্রীর ভাষ্য বলিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—"সত্যং পরং ধীমহি।" গায়ত্রী সেই পরম সত্যেরই বাঙ্ময়ী প্রতিমা। কোন কোন সাধক শ্রীমদ্ভগবত গীতাকেও গায়ত্রীর বিবৃতি বলিয়া গিয়াছেন। গায়ত্রীর প্রাত, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার রূপ চিন্তা করুন—ব্রহ্মাণী বৈষ্ণবী ও মাহেশ্বরী কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান। গীতার তিনটি ষটকের বিষয় বিভাগ লক্ষ্য করুন—প্রথম ষটক কর্ম্ম-যোগ, দ্বিতীয় ষটক ভক্তিযোগ, তৃতীয় ষটক জ্ঞানযোগ। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি বা ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম কেন হইল না, তাহার রহস্যই হইতেছে—গীতা ও গায়ত্রীর মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।

গায়ত্রীর পঞ্চোপাসনার কথা বলিতেছিলাম। গায়ত্রীর বৈদিক ব্যাখ্যায় যেমন ত্রিবিধ মূর্ত্তি দেখিলাম, তান্ত্রিক ব্যাখ্যায় তেমনই পঞ্চোপাসনার ইঙ্গিত রহিয়াছে। আমাদের সর্ব্ব কর্ম্মে উপাস্য পঞ্চদেবতার মধ্যে রহিয়াছেন—সূর্য্য বহ্নি, বিষ্ণু, শিব ও দুর্গা। গণেশকে আদি ধরিয়া দেবতা ছয়জন গণেশঞ্চ দিনেশঞ্চ বহ্নি, বিষ্ণু, শিবং শিবা।" গায়ত্রীর মধ্যে—ব্রহ্মা, সূর্য্য, শিব, শক্তি ও বিষ্ণু এই পঞ্চদেবতাই আছেন। পরবর্ত্তী কালে (মহর্ষি ও দেবর্ষি) নারদের পাশে ব্রহ্মার তান্ত্রিক উপাসনা নিষিদ্ধ হইয়া গেল। অগ্নিরূপে ব্রহ্মা উপাসনার ক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইলেন। তিনি যজ্ঞক্ষেত্রে উপাস্য রহিলেন। অগ্নি উপাসকগণ আর্য্যসমাজ হইতে অপাংক্তেয় হইয়া গেলেন। তাঁহার স্থানে বিষ্ণুর অবতার গণেশ উপাস্যরূপে পরিগৃহীত হইলেন। অগ্নির কোন সম্প্রদায় রহিল না। কিন্তু তিনি পঞ্চ দেবতার মধ্যে পূজ্য রহিয়া গেলেন।

গায়ত্রীর মধ্যে আমরা—ত্রিলোকব্যাপী সর্ব্বময়, চেতনা, চেতন জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, সর্ব্বারাধ্য, লীলাময়, এবং জীববুদ্ধির প্রেরণকারী, এই পাঁচটি তত্ত্বের

সন্ধান পাই। (১) ভুভুর্বঃ স্বঃ এই ত্রিলোক ব্যাপিয়া যিনি অবস্থিত রহিয়াছেন সৎশক্তি। (২) তৎসবিতুঃ—যাহা হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, চিৎশক্তি। স্রষ্টা এবং প্রকাশক। (৩) বরেণ্যং—আরাধ্য শিবস্বরূপ, মঙ্গলময়। (৪) ভর্গো—ইনিই সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী লীলাময়, ব্রহ্ম যাহার অঙ্গ জ্যোতি, আনন্দময়। দেবস্য ধীমহি—তাঁহাদেরই ধ্যান করি। (৫) ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ—যিনি আমাদের বুদ্ধি বৃত্তির প্রেরণা দিতেছেন। পরা প্রকৃতি মায়া—মহামায়া ও যোগমায়া। "প্রকৃতিং ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ" ইহাই যদি বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণের অর্থ ধরা হয় এবং যদি বলা যায়—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া।" তাহা হইলেও অসঙ্গত হয় না।

গায়ত্রীতত্ত্বে এই পঞ্চোপাসনার রহস্য ভিন্ন, গায়ত্রীর নিজস্ব স্বরূপও রহিয়াছে সুতরাং গণেশ, দিনেশ, বহ্নি, বিষ্ণু, শিব ও শিবা কাহাকেও বাদ না দিলেও চলে। অর্থাৎ গায়ত্রীর উপাসক যদি আপন অভিলষিতানুরূপ ইহার মধ্যে কোন একটি উপাসনা বাছিয়া লন, তাহাতে গায়ত্রী উপাসনার কোন ক্ষতি হয় না। গায়ত্রীর দ্বারাই সেই সেই দেবতার উপাসনা চলিতে পারে। পূর্ব্বে আমরা গায়ত্রীর মধ্যে তিন পুরুষ ও তিন শক্তিকেই লক্ষ্য করিয়াছি। সুতরাং সপ্রণব ব্যাহৃতিযুক্ত গায়ত্রী সকল সম্প্রদায়েরই উপাস্য। তিনিই ভক্তি মুক্তি প্রদায়িনী ভক্তি বিধাত্রী এবং ভূতধাত্রী জগজ্জননী। মধুকৈটভ বধে মহিষাসুর মর্দ্দনে এবং শুম্ভ নিশুম্ভ নিকুম্ভনে ইনিই জগতের মঙ্গল বিধান করেন। তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি।

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী

ভূমির্দৃপ্তনৃপব্যাজদৈত্যানীকশতাযুতৈঃ।
আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ॥

ভূমিভার অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা প্রজানুরঞ্জনের জন্যই পৃথিবীতে আসিয়াছে, যে সমস্ত শিশ্নোদরপরায়ণ দৈত্য আত্মসুখ-সম্ভোগের জন্য রাজব্যাজে সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে, ক্রব্যাদ-কাপট্যের ঘনীভূত মূর্তি পাশব ব্যসনাসক্ত সেই সমস্ত পিশাচের অকথিত অত্যাচার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। প্রধানতঃ এই ভূমিভার হরণের জন্যই শ্রীভগবানের রূপান্তরে অবতরণ। নবপয়োদ-নিন্দিতরূপ, পরিধানে পীতবসন, বক্ষে কৌস্তুভ, সর্বাঙ্গে রত্নাভরণ, শিরোদেশে বৈদূর্যময় মনোহর কীরিট, চতুর্ভুজে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম, কংস কারাগারে তিনি এই রূপেই প্রকাশিত হইয়াছিলেন। এই অবতারের বৈশিষ্ট্য, তিনি বন্ধনের মধ্যেই অভ্যুদিত হইয়াছেন, লৌহ-শৃঙ্খলের গণ্ডিবেষ্টনেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। অবহেলিত প্রাসাদ শীর্ষে বিন্দুমাত্র ক্ষত বক্ষেই যেমন বায়ুতাড়িত অণুপ্রমাণ বটবীজ আশ্রয় প্রাপ্ত হয় এবং কালের নিয়মাধীনে অনুকূল বৃষ্টি ও রৌদ্রের সহায়তায় ধীরে ধীরে আত্ম-প্রকাশ করে, অবশেষে মৃত্যুর শত বাহু স্বরূপ আপন লেলিহান শত মূল বিসর্পণে সেই উত্তুঙ্গ প্রাসাদসৌধকে জীর্ণ করিয়া ফেলে ধরাশায়ী করিয়া দেয়, তেমনই অত্যাচারের সংকল্প সূচনাতেই অত্যাচারীর মৃত্যুবীজ অমোঘ নিয়তির তাড়নে তাহার মধ্যেই জন্মলাভ করে। অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই বীজও অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। কালে সেই দিগন্ত বিস্তৃত শতশাখ বিশাল বিষবৃক্ষ অত্যাচারীকে গ্রাস করিয়া লয়। কংস কারাগারে এই মহাসত্যই সে দিন আপন জ্যোতির্ময় স্বরূপে বসুদেব দেবকীর নয়ন-পথবর্ত্তী হইয়াছিলেন। মোহরাত্রি-রূপিণী বিষ্ণুমায়া আপন মায়ায় সেই রাত্রিতে সমগ্র মথুরাপুরীকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিলেন। মৃত্যুর এই অলক্ষিত পদসঞ্চার সে দিন সদা সতর্ক কংসেরও শ্রবণগোচর হয় নাই। সদাজাগ্রত কারা-প্রহরীগণের অতন্দ্র নয়ন সেদিন কোন্ মোহজালে নীমিলিত হইয়া গিয়াছিল, মূঢ়েরা জানিতেও পারে নাই। সেই পরম ক্ষণে দশ দিক নির্মল হইয়াছিল, নদী-সরোবরের সলিলের আবিলতা তিরোহিত হইয়াছিল,

কমলদল প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, বনরাজী ফুলদলে শোভিত হইয়াছিল, প্রসন্ন গ্রহ-তারকার দ্যুতিতে নভোমণ্ডল প্রভান্বিত হইয়াছিল। দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন, সিদ্ধগণ স্তব করিয়াছিলেন, অপ্সরা কিন্নরেরা নৃত্য করিয়াছিলেন, মন্দ মন্দ মেঘ গর্জন, বিন্দু বিন্দু বারি বর্ষণ, মথুরাবাসীরা কিন্তু কিছুই জানিতে পারে নাই। যাঁহারা জানিয়াছিলেন—তাঁহারাও অন্তরের আনন্দ প্রকাশ করিতে সাহস করেন নাই। ভগবানের আগমন মর্তবাসীর উল্লাস প্রকাশে সেদিন অভিনন্দিত হয় নাই।

যে শুভ সময়ে কংসকারাগারে দেবকীনন্দন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ঠিক সেই পরম লগ্নেই গোকুলে নন্দমন্দিরে যশোদা-দুলালের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। অঘটনঘটন-পটিয়সী যোগমায়া কংসের কারাকক্ষে বসুদেব দেবকীকে সচেতন রাখিয়া অপর সকলকেই মোহগ্রস্ত করিয়াছিলেন। গোকুলে কিন্তু তিনি জননী যশোদাকে জানিবারও সুযোগ দেন নাই, তিনি প্রসব করিলেন। বসুদেব দেবকীকে জাগ্রত রাখার প্রয়োজন ছিল, কারণ ভগবান কারাকক্ষ পরিত্যাগ করিবেন। আর যশোমতীকে অচেতন রাখার প্রয়োজন ছিল, তাঁহার কক্ষ আলো করিয়া কাহার আবির্ভাব হইল তাহা জানিতে না দেওয়া, কারণ অনতিপরেই তাঁহার দুইটি সন্তানের মধ্যে কন্যাটি স্থানান্তরিত হইবেন। স্বয়ং পুরুষোত্তম শ্রীনন্দনন্দনরূপে ধরাবাসীকে ধন্য করিলেন, অথচ তাঁহার আবির্ভাব লগ্নও কোনরূপ উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনিতেও অভিনন্দিত হইল না, অন্যরূপ উৎসব উল্লাস তো দূরের কথা।

নন্দনন্দন যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, শ্রীশুকদেব সুস্পষ্ট ভাষায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন—"নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে" এই শ্লোকে। এই শ্লোকের "তু"কার যে পাদপূরণে ব্যবহৃত হয় নাই. শ্রীমদ্ভাগবতের বহু টীকাকার তাহা বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বসুদেবের পুত্র জন্মের পরদিন উৎসব দূরের কথা—সেই কুপ্রভাত তাঁহার পক্ষে শোকেরই কারণ হইয়াছিল। এদিকে জাতাহ্লাদ মহামনা নন্দ কিন্তু পরদিন মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহা ঐ "তু" প্রয়োগের উদ্দেশ্য। নন্দেরও পুত্র হওয়ায়—শ্লোকার্দ্ধের ইহাই অর্থ। আর "আত্মজ" শব্দটি আপন পুত্র ভিন্ন কি অপর কোন অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে? আজ পর্যন্ত কোন বৈয়াকরণ, কোন অভিধানকার এ শব্দের অপর অর্থ করিয়াছেন বলিয়া জানি না। গোবৎস হরণের পর বেদের প্রথম দ্রষ্টা, সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং ব্রহ্মাও সুস্পষ্ট শব্দে নন্দনন্দনকে বলিয়াছেন—"পশুপালজায়"! পশুপালক নন্দের অঙ্গজ, অঙ্গজ তো আপন পুত্র। পালিত

পুত্রকে ব্রহ্মা কখনই অগ্রজ বলিতেন না। বসুদেব নন্দালয়ে আসিয়া আপনার পুত্রটিকে রাখিয়া যশোদার যে কন্যাটিকে লইয়া কংস-হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন, শ্রীশুকদেব তাঁহাকে বিষ্ণুর অনুজা বলিয়াছেন। পশ্চাৎ না জন্মাইলে অনুজা হইবেন কিরূপে? যোগমায়া—একানংশা যে যশোদা গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন, জগজ্জননী নিজ মুখেই তাহা দেবগণের সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন। চণ্ডীতে মহর্ষি মেধসের নিকট হইতে সংবাদটি জানিতে পারা গিয়াছে। সুতরাং একানংশার যশোদা গর্ভে আবির্ভাব সত্য ঘটনা। বিষ্ণুর পরে না আসিলে তিনি অনুজারূপে উক্তা হইতেন না। এই বিষ্ণু কৃষ্ণ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাসুত বলিয়াও কথিত হইয়াছেন। কাত্যায়নী-ব্রত-পরায়ণা গোপীগণ নন্দগোপ-পুত্রকেই পতিরূপে প্রার্থনা করিয়াছেন এবং শ্রীরাসমণ্ডলের নন্দনন্দনের সঙ্গেই মিলিতা হইয়াছেন। সুতরাং কোন সন্দেহ নাই যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনন্দনন্দন।

প্রশ্ন উঠিতে পারে বসুদেব তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না কেন? উত্তরে বলিতেছি, দেখিবেন কিরূপে? তিনিই যে কংসকারাগারে গিয়া প্রাকৃত শিশু হইলেন। প্রাকৃত শব্দের অর্থ, যাহা তাঁহার প্রকৃত রূপ, সেই স্বয়ংরূপ। যাঁহার ধাম, পরিকর, নাম, রূপ সমস্তই অপ্রাকৃত, শুকদেব তাঁহাকে প্রাকৃত শিশু বলিয়া প্রত্যবায়গ্রস্ত হইবেন। শ্রোতৃমণ্ডলীকে পাপপঙ্কে নিক্ষেপ করিবেন—এই চিন্তাই তো মহাপাপ। অতি সাধারণ ব্যক্তিও প্রাকৃত অপ্রাকৃতের প্রভেদ জানে। কোন কাণ্ডজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিই অপ্রাকৃতকে প্রাকৃত বলিবেন না। মথুরার কারাকক্ষে আত্ম পরিচয় দিয়া, অভয় দিয়া ও 'গোকুলে আমাকে রাখিয়া আইস' এই আদেশ দিয়া চতুর্ভুজ যে দ্বিভুজ হইলেন, তাহার একমাত্র সমাধান এই যে, নন্দনন্দন মথুরায় গিয়া চতুর্ভুজকে আত্মসাৎ করিয়া লইলেন। এবং দ্বিভুজ নরাকারে আপন স্বরূপে প্রকাশিত হইলেন। বসুদেব এই নন্দনন্দনকেই গোকুলে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। আপন পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়াই নন্দ মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন।

আজ শ্রীভগবানের দুই রূপের—অংশরূপের এবং স্বয়ংরূপের আবির্ভাবের তিথি। এই তিথি পালন, এই তিথিকৃত্যের অনুষ্ঠান আমাদের অবশ্য কর্তব্য। অন্যথায় কৃতঘ্নতার মহাপাপে লিপ্ত হইব। কারণ একদিন বিষম সংকটের সন্ধিক্ষণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই ভারতকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এবং তাঁহাকে স্মরণ করার অর্থই আমাদের সকলেরই ভারত রক্ষার যোগ্যতা অর্জন করা। স্বধর্মে স্থিতি, সদাচার পালন, শ্রীভগবদ্মুখ-নিঃসৃত অনুশাসন অনুসরণ, অহঃরহ

তাঁহাকে স্মরণ, তাঁহার নাম-গুণ-লীলাকীর্তন, ইহাই আমাদের নিত্য ব্রত। ইহাতেই ভারত তাহার ভারত্ব লইয়া রক্ষা পাইবে। আজিকার দিনে সেই নিত্যব্রতই বিশেষরূপে অনুষ্ঠেয়।

তিনি আসিয়াছিলেন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান নিবারণ করিতে। তিনি আসিয়াছিলেন, সাধুগণের পরিত্রাণ ও বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। এই সমস্ত ছাড়াও তাঁহার আবির্ভাবের আরো একটি কারণ ছিল। ভূতসকলকে অনুগ্রহ করিয়া নর-তনু আশ্রয়পূর্বক তিনি এমন কতকগুলি লীলা করেন, যাহা শুনিয়া মানুষ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়, ভগবৎপরায়ণ হয়। মথুরা এবং গোকুল এই দুই অধিষ্ঠান-ভূমি হইতে দেখিলেই এই অবতরণ রহস্যের মর্মার্থ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। আজিকার দিনে এই রহস্যেরই অনুধ্যান করিতে হইবে।

মথুরা এবং গোকুল—কোনক্ষেত্রেই আমরা ভগবদাবির্ভাবে আনন্দ উৎসবের সুযোগ পাই নাই। আমাদের এ দুঃখ রাখিবার স্থান ছিল না। অন্তর্যামী তাহা জানিয়াছিলেন, তাই তো সেদিন আচণ্ডাল আমাদিগকে সেই সুযোগ দিয়া কৃতার্থ করিলেন। সেদিন কোন দুর্যোগ ছিল না। বসন্ত কাল, তরুলতায় কিসলয়, নব কুসুমের অভিযান, শাখায় শাখায় বিহগ কুলের কলগান, সুগন্ধ এবং সঙ্গীতের অপূর্ব সমারোহের মাঝখানে সন্ধ্যাদেবী আসিয়া দেখা দিলেন। তিথি ছিল পৌর্ণমাসী, রাহু আসিয়া পূর্ণচন্দ্রকে গ্রাস করিল। আনন্দিতা সুরধুনী উছলিয়া উঠিলেন। নীরে স্নান-রত নরনারীর কণ্ঠোচ্চারিত হরিধ্বনি। তীরে পুণ্যস্নানে সমাগত অগণিত কণ্ঠে কীর্তিত হরিনাম—এহেন শুভক্ষণে শচীগর্ভ-সিন্ধু হইতে সমুদিত হইলেন অকলঙ্ক নদীয়ার চন্দ্র পতিতপাবন শ্রীগৌরাঙ্গদেব। সেদিন কাঙ্গালের ঠাকুরকে পাইয়া বাঙ্গালীর ক্ষোভ মিটিয়াছিল—বাঙ্গালী হরিধ্বনিতেই হরিনাম মূর্তিকে স্বাগত জানাইয়াছিল। হরিনাম বিলাইবার জন্য হরিনামকে সঙ্গে লইয়াই শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত তনু শ্রীমন্ মহাপ্রভু বাঙ্গলার ব্রজভূমি নদীয়ায় শুভাগমন করিয়াছিলেন। সার্থক হইয়াছিল শ্রীশুকদেব বাক্য—

"ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া
যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।"

মনে কি রাখে লোকে, না মনে থাকে? মনে রাখাও শক্ত বৈ কি! মনে রাখার ঝঞ্ঝাটও অনেক। এই ধর না কেন, এক সঙ্গে পাঠশালে পড়িয়াছিলাম। নয়তো উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে সহপাঠী ছিলাম। আপন প্রতিভায়, পয়সায় কিম্বা মরুব্বির জোরে তুমি সাগর পাড়ি দিয়া পারদর্শী হইয়া ফিরিয়াছ। এখন তোমার জমাট পসার, দব্‌দবা যত, রব্‌রবা তত। এহেন সময়ে আমি যদি পাঠশালার কিম্বা বিদ্যালয়ের সুবাদে তোমার কুঠীতে গিয়া হাজির হই? তুমি মুস্কিলে পড়িবে না? কয়েক দিনের জন্য শিক্ষকতা করিয়াছিলা, নয়তো মফঃস্বল কোর্টে ওকালতি। এখন তুমি হাইকোর্টের জজ। সমব্যবসায়ী শিক্ষক, কি উকিল ছিলাম বলিয়া তোমার নিকট সোহাগ ঝালাইতে যাওয়া এখন আমার পক্ষে চরম বেয়াদবি নয় কি? অবশ্য সব মানুষ সমান নয়। এমন মহানুভব এখনো আছেন যাঁহারা পূর্ব পরিচয় স্মরণ রাখেন, বাল্য বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখেন, অতীতের মাখামাখির সম্মান রাখেন। অবস্থার পার্থক্যটা গায়ে মাখেন না। মনে রাখা ও মনে না রাখার অনেক গল্প আছে।

কৃষ্ণ কথা প্রসঙ্গেই মনে রাখার গল্প পরে বলিব। ভূমিকায় কৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়টা অগ্রে বলিতেছি। কৃষ্ণ চরিত্রের দিক্ দর্শন। সাধারণের ধারণা—প্রতিপালিত হইয়াছিলেন গোপ পল্লীতে। কিন্তু আচার্যগণ বলেন, না। তাঁহারা বলেন নন্দ মহারাজেরও পুত্র হইয়াছিল। একটা গান শুনিয়াছিলাম—কি প্যাঁচে ফেল্‌লে দিগম্বর'! শুকদেব গোস্বামী আমাদিগকে সেই প্যাঁচে ফেলিয়াছেন। তিনি সেদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরে কংসের কয়েদখানা হইতে বসুদেবাব সটান সদ্যোজাত পুত্র সহ ব্রজধাম নন্দালযে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। বসুদেব তো ফিরিয়া গেলেন। এদিকে বৈয়াসকি বলিয়া বসিলেন—'নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদ মহামনায়ঃ' 'আত্মজ উৎপন্ন হওয়ায় জাতা হ্লাদ মহামনা নন্দ'। আত্মজ তো আর পালিত পুত্রকে বলে না। যাহা হউক গোপ গৃহেই গোপালের কৈশোর অতিবাহিত হইল। লেখাপড়াটা শেখা হইল না, কিন্তু শিখিয়া গেলেন তিনি অনেক কিছু। বলিতে গেলে সারা জীবনের পাথেয় তিনি এই গোপ পল্লী হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শিখিয়া গিয়া ছিলেন মাতৃস্নেহ কাহাকে বলে, পিতৃস্নেহ কাহার নাম! শিখিয়া গিয়াছিলেন—

সৌহার্দ্য কেমন অব্যবহিত হয়। কত ব্যবধান রহিত, কত সুন্দর, কত অনাবিল হয়। হয় কত অকপট অনাড়ম্বর! আর প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া গিয়াছিলেন স্বার্থ গন্ধহীন অহৈতুকী ভালবাসার অনুপম মাধুর্য। দেখিয়া গিয়াছিলেন কতকগুলি বনচরী কিশোরী কেমন করিয়া সর্ব ধর্ম ত্যাগ করিতে পারে। সংসার, সমাজ, স্বজন সব ছাড়িয়া সর্বস্ব সমর্পণে জীবনে চরম ও পরম সত্যকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারে। সে ভালবাসা কেমন মহিমাময়, কত পবিত্র কত ভাস্বর, কত সুদূর-প্রসারী, কত গভীর, তিনি তাহার পরিমাপ করিতে পারেন নাই। বৃন্দাবন ভারতীয় সাধনার শাশ্বত প্রতিরূপ। মানস প্রকর্ষের রম্য নিকেতন, প্রাণ প্রাচুর্যের ছন্দিত সমগ্রতা বৃন্দাবন সত্য সনাতন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মনকে চিরবন্দী করিয়া রাখিয়াছে।

কংসের আহ্বানে শ্রীকৃষ্ণ মথুরা যাত্রা করিলেন। কংস জানিত না অত্যাচারীর মৃত্যু বীজ তাহার অত্যাচারের মধ্যেই অঙ্কুরিত হয়। এবং অদূর ভবিষ্যতেই অঙ্কুর বৃক্ষে পরিণতি লাভ করে। বৃক্ষের বিষাক্ত শিকড় অত্যাচারীর উত্তুঙ্গ অহং সৌধকে শত পাকে জড়াইয়া শতখান করিয়া ধ্বংসের পথে টানিয়া আনে। বৃক্ষের শাখা প্রশাখার মহতী বিনষ্টির নিরন্ধ্র অন্ধকারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় তাহার আয়ু শ্রী যশ ধর্ম এমন কি লোকের আশীর্বাদ পর্যন্ত না জানিয়া কংস আপন মৃত্যুকেই আমন্ত্রণ জানাইয়াছিল। যাহারা নৃপ-ব্যাজে— রাজার ছদ্মবেশে শাসন ও শোষণের সভ্যতাসম্মত মসৃণ পথে বিলাস ও ব্যসন চরিতার্থ করিতে আসিয়াছিল, বাহুবল দর্পিত ঐশ্বর্য মদান্ধ কাম কলুষিতচিত্ত সেই সমস্ত দৈত্য দলের প্রতীক ছিলেন কংস। অশূরাক্রান্তা পৃথিবী কুব্জা রূপে রাজধানীতে বন্দিনী ছিলেন কংসের মাল্যোপজীবনী বেশে। যখনই যিনি রাজা, তখনই তিনি ভূস্বামী। ভূশক্তি কুব্জা তাই মথুরায় পণ্যারমণী।

কংস ধ্বংস হইয়া গেল। ফিরিয়া গেলেন নন্দ উপানন্দ প্রভৃতি। ফিরিয়া গেলেন শ্রীদামাদি ব্রজরাখালগণ কৃষ্ণশূন্য বৃন্দাবনে। মথুরায় রহিয়া গেলেন কৃষ্ণ বলরাম। মথুরার সিংহাসনে বসিলেন উগ্র সেন। এইবার বসুদেবের দৃষ্টি পড়িল পুত্র দুটির দিকে। লেখাপড়া তো চাই! কৃষ্ণেরই বয়স এগার পার হইয়া গিয়াছে, বলরাম তো আরো বড়। এখনো হাতে খড়িই হয় নাই, কি লজ্জা! বসুদেব সংবাদ লইলেন হাতে খড়ি হইয়াছিল কৃষ্ণের গোকুলে তবে পাঁচন বাড়ি দিয়া। আর শুভ দিনে শুভ ক্ষণে সুরু হইয়াছিল গোবৎসচারণ! মা যশোদার কত অনুনয় বিনয়, কত কাকুতি! ঐ দুধের ছেলে, পাঁচ বৎসরের শিশু না-কি বাছুর চরাইতে গোষ্ঠে গিয়া রোদে বাতাসে ঘুরিতে

পারে ! নন্দ মহারাজ কত সান্ত্বনা দেন, গোয়ালার ঘরে বংশগত বৃত্তি না শিখিলে চলিবে কেন। বৎস চারণে হাতে খড়ি পরে ধেনুর পাল লইয়া গোপালকেই তো বনে বনে ফিরিতে হইবে। নন্দ ভাবিয়া ছিলেন গোকুলের গোপাল গোকুলেই থাকিবে চিরদিন। বসুদেব মনে মনে নন্দকে ক্ষমা করিলেন। সন্ধান লইয়া জানা গেল সান্দীপনি মুনি বেশ বিদ্বান ব্যক্তি, প্রায় সর্ববিদ্যা বিশারদ, সুকুমার মতি বালকদের শিক্ষা দিতে সুদক্ষ। আর তাঁহার গৃহিণীও ভারি সুশীলা গৃহকর্মে নিপুণা, রাঁধেন বাড়েন ভালই। পতিদেবতার অন্তে বাসীদের তিনি পুত্রাধিক আদর যত্ন করেন। সুতরাং রামকৃষ্ণ দুটি ভাইকে সান্দীপনি মুনির পাঠশালাতেই পাঠানো হইল। সেকালে বিদ্যার খরিদ বিক্রী ছিল না। মহাভারত আদি পর্বে খাণ্ডব দাহনের পূর্বে মন্দপাল ঋষির উপাখ্যানে দেব ঋণ, ঋষি ঋণ ও পিতৃ ঋণের উল্লেখ আছে। ইহারই অপর নাম অর্থ ধর্ম ও কাম চলতি কথা জীবিকা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। বিনা বেতনে গুরু গৃহে বাস করিয়া খাইয়া যে লেখাপড়া শেখা যাইত, বাড়ীতে ছাত্র রাখিয়া খাওয়াইয়া লেখাপড়া শিখাইয়া সেই দেনা-শোধ করিতে হইত। দেনা শোধের অন্যান্য পদ্ধতিও ছিল।

রামকৃষ্ণ দুটি ভাইয়ের বুদ্ধি ভালই ছিল। স্মৃতি শক্তিও মন্দ ছিল না। অল্প দিনেই তাহার সর্ববিদ্যায় পারঙ্গম হইয়া উঠলেন। কুস্তিটা গোয়ালঘরের ছেলেদের সঙ্গেই শিখিয়াছিলেন কৃষ্ণ। হাত সাফাইটা ছিল সহজাত! এবং হাতের কসরৎও প্রচুর জানা ছিল। তাঁর বাহু প্রহরণেই বৃন্দাবনে তিনি অনেক তাবড় তাবড় অসুরের প্রাণবায়ু হাওয়ায় মিলাইয়া দিয়াছিলেন। কংসের মত বীর তো তাঁহার সঙ্গে বাহু যুদ্ধেই ইহধাম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তবে তিনি ধনুর্বেদটা কোথায় শিখিয়া ছিলেন ঠিক জানা যায় না। যাহা হউক সান্দীপনির পাঠশালায় লেখাপড়াটা ভালই শিখিলেন। তবে গুরুদক্ষিণাটা খুব বড় রকমেরই দিতে হইল। যাহাকে বলে যমালয় হইতে মানুষ ফিরাইয়া আনা। মৃত পুত্র দান !

মথুরায় তিনি টিকিতে পারিলেন না। কংসের দুই বিধবা পত্নী অস্তি ও প্রাপ্তি ভীষণ উত্তেজিত করিয়া তুলিল পিতা ঠাকুরকে। কংসের শ্বশুর জরাসন্ধ বারবার মথুরা আক্রমণ করিতে লাগিলেন। এ কালের গজনীর মামুদের সঙ্গে সে কালের জরাসন্ধের কতকটা তুলনা হয়। জরাসন্ধ সতেরবার মথুরা আক্রমণ করিয়াছিলেন। নিরীহ মথুরাবাসীগণকে রক্ষার নিমিত্ত কৃষ্ণ স্থান ত্যাগ করিলেন। উঠিলেন গিয়া সাগর-মেখলা রৈবতক গিরিশিরে। যাদবগণের

সাহায্যে রাজধানী দ্বারকা নগরী প্রতিষ্ঠিত হইল। কথায় বলে ছত্রিশ কোটী যদু বংশ। সুতরাং বাহুবলে তিনি অজেয় হইয়া উঠিলেন। আর কোথা হইতে যে এত ধনসম্পদ সংগ্রহ করিলেন ভগবান জানেন। অতুলনীয় ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল দ্বারকা নগরী। সারা ভারতে খ্যাতি রটিয়া গেল ধন-বলে জনবলে দ্বারকার দ্বিতীয় নাই।

পাণ্ডবদের সাহায্যে তিনি জরাসন্ধকে শেষ করিয়া ফেলিলেন। রাজসূয় যজ্ঞের সূচনাতেই কৃষ্ণ মথুরা ত্যাগের প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন। যজ্ঞান্তে শিশুপাল প্রাণ দিলেন। সে এক কাণ্ড! যজ্ঞ সমাপ্তি মুখে সমাগত জনগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষকে অর্ঘ নিবেদন করিতে হইবে। যজ্ঞস্থলেই প্রমানিত হইবে কে ভারতের প্রতিনিধি, কোন্ জন পুরুষোত্তম। সহদেব কুরু পিতামহ ভীষ্মদেবের পরমর্শ প্রার্থনা করিলেন। ভীষ্মদেব বলিলেন—ঐ যে যজ্ঞমণ্ডপের প্রবেশ পথে ভৃঙ্গার হস্তে সমাগত ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনে স্বেচ্ছায় ব্রতী রহিয়াছেন। উহাকেই লইয়া আইস। শুধু বর্তমান ভারতবর্ষে নয়, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ—সর্বকালের নরোত্তম ঐ শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ শ্রেষ্ঠ। উহারই পদ প্রান্তে পূজার অঞ্জলি প্রদানপূর্বক বিশেষার্ঘ স্থাপন কর উহারি বিনয়াবনত গগন গৌরব স্পর্ধা সমুন্নত শিরোদেশে। ভীষ্মের এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছিল মন্দবুদ্ধি চেদীপতি। প্রাণ দিয়া তাহাকে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল। এই কৃষ্ণ।

মুনি-ঋষি সকলকেই আমি মানব সংজ্ঞায় অভিহিত করিতেছি। মানবের দিব্য-কল্পনা কত সুদূরপ্রসারী হইতে পারে, ভারতের পুরাণে, উপ-পুরাণে, তন্ত্রে, কাব্যে-নাটকে, জাতকাদিতে তাহার বহু নিদর্শন আছে। পুরাণে লিখিত আছে—

দেবাসুরে একবার সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন। সেই মন্থিত মহোদধি হইতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। কমলালয়া শ্রীদেবী। সর্ব সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী সৌন্দর্য প্রতিমা মহালক্ষ্মী। ক্ষীর সাগর তীরে ভুজগ-শয়নে শায়িত রহিয়াছেন নারায়ণ, তাঁহারই পদতলে উপবিষ্টা দেবী দয়িত পাদসম্বাহনে নিরতা।

অপরা এক দেবী বাক বাণী সরস্বতী প্রভৃতি ইঁহার অনেক নাম। প্রাণীর কণ্ঠে কণ্ঠে তাঁহার অধিষ্ঠান। তাঁহারই করুণায় মানবের বাক্য স্ফুরণ হয়। যাবতীয় ললিতকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এই বিদ্যারূপিণী। কোন কোন পুরাণে লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুই সহোদরা। জনক দেবাদিদেব মহাদেব।

'কেন' উপনিষদের উমা-হৈমবতী ব্রহ্ম-স্বরূপিণী। দাক্ষায়ণী এবং পার্বতী ইঁহার দুই রূপ। দক্ষালয়ে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন মহাদেবী। দক্ষযজ্ঞে বিনা নিমন্ত্রণে গিয়া দক্ষের মুখে শিবনিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগ করেন। এই দাক্ষায়ণীই নগাধিরাজের কন্যারূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। ভাঙ্গর-ভোলা মহেশ্বরের ঘরণী, আদর্শ গৃহিণী। কত কাব্য, কত গাথা, কত গান রচিত হইয়াছে এই হরপার্বতীকে কেন্দ্রে রাখিয়া। জগতের অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা। স্মরণাতীত কালে উদ্গীত ঋগ্‌বেদের দেবীসূক্তে, মহাকবি কালিদাসের কুমারসম্ভবে এবং ইদানীং কার কালের কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে বিভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন কালে নানারুচির কণ্ঠের গানে এই দেবীরই জয়ধ্বনি শুনিতে পাই। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর মধ্যে ইঁহারে আর এক রূপ। এই দেবীই মধুকৈটভ বধের হেতু হইয়াছিলেন। মদমত্ত মহিষাসুর ইঁহারই হস্তে নিহত হইয়াছেন। এই দেবীর উদ্দেশেই পাঠ করি—

"নিশুম্ভ শুম্ভ নির্ণাশী বিধাত্রী
বরদে নমঃ।"

চণ্ডীর প্রথম চরিত্রের অধিষ্ঠাত্রী মহাকালী। ইনিই যোগনিদ্রা, বিষ্ণুকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন হরিনেত্র হইতে অন্তর্হিতা হইয়া। বিষ্ণু মধু ও কৈটভকে

বধ করেন। দ্বিতীয় চরিত্রের অধিষ্ঠাত্রী মহালক্ষ্মী স্বয়ং মহিষাসুর বধকর্ত্রী। তৃতীয় চরিত্রে দেবী মহাসরস্বতীরূপিণী। শুম্ভ নিশুম্ভ ইহারই হস্তে নিহত হইয়াছিলেন।

অপরা এক মহীয়সী নারী সাবিত্রী। এই ঘোরতর দুর্দিনেও বহু পল্লী রমণী অবৈধব্য কামনায় সাবিত্রী ব্রতের অনুষ্ঠান করেন—একাদিক্রমে প্রতি সাবিত্রী চতুর্দশীতে চতুর্দশ বর্ষ। প্রাচীনপন্থিগণ আজিও পত্রের শিরোনামায় পাঠ লেখেন "সাবিত্রী সমানাসু"। কন্যা ও বধূদের আশীর্বাদ করেন "সাবিত্রী সমান হও"। শমন বিজয়িনী এই নারী পর্ণকুটীরেও যেমন, রাজ সিংহাসনেও তেমনই সমান শোভমানা।

পুরাণে সমুদ্রসম্ভবা আর এক রমণী উর্বশী। অতলান্ত মহাসাগরের মতই রহস্যময়ী। কবি বলিয়াছেন মাতা নও, কন্যা নও, বধূ নও; যুগ-যুগান্তর ধরিয়া তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী। জায়া নহে প্রিয়া। স্বর্গবাসিনী এই অপসরীকে স্বর্গ-সুখ-সম্ভোগের অধিকারী যখনই যে পুরুষ গিয়া কামনা করিয়াছেন, তিনি সাদরে সেই ভাগ্য-বানকেই সম্ভোগ শয্যায় স্থান দিয়াছেন। অনন্তযৌবনা এই উর্বশী পুরুষের সুখ-সঙ্গিনী।

মহাকবি কালিদাস মেঘদূতে এক অকল্পনীয় কল্পলোকের সন্ধান দিয়াছেন। যেখানে আনন্দাশ্রু ভিন্ন অশ্রু নাই, প্রণয় কলহ ভিন্ন কলহ নাই, মদন শরজ ভিন্ন সন্তাপ নাই, যৌবন ভিন্ন বয়স নাই। সেই দেশের যুবক-যুবতীর দিনচর্যার বর্ণনাও করিয়াছেন কবি।—কি তাহাদের সারাদিনের কাজ? মন্দাকিনীর স্বর্ণ-সৈকতে গিয়া নায়ক-নায়িকার একজন একটি মণি লুকাইয়া রাখে, অন্যজন তাহারই অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়—এই কাজ! যখন তাহারা পরিশ্রান্ত হয়, পুষ্পিত মন্দার তরুর ছায়াতলে গিয়া বিশ্রাম করে—এই কাজ। মাঝে মাঝে বৈভ্রাজপুরীর বহিরোদ্যানে গিয়া যুগলে মিলিয়া কিন্নর ও কিন্নরীগণের সঙ্গীত শ্রবণ করে এই কাজ।

শ্রীরাধার সঙ্গে কিন্তু কাহারো তুলনা হয় না। ভূমি যেখানে চিন্তামণিময়, জল অমৃত, তরু কল্পতরু, লতা কল্পলতা, ধেনু কামধেনু, নরনারীর কথা গান, গমন নৃত্য, সেই আনন্দ-নিকেতন শ্রীবৃন্দাবনের বনদেবী এই শ্রীরাধিকা। তিনি চির-কিশোরী। রস-স্বরূপ যিনি, আনন্দের শ্রীবিগ্রহ যিনি, পূর্ণ-ব্রহ্ম সনাতন চিরকিশোর শ্রীকৃষ্ণ তাহার জীবনবল্লভ। মরণ মহোদধিমথিত অমৃত এই শ্রীকৃষ্ণেরই চরণোদক।

এই ভারতের নশ্বর পার্থিব বিত্তের তুচ্ছতায় উচ্চকিতা এক রমণীর কণ্ঠেই

একদিন উচ্চারিত হইয়াছিল—"যেনাহং নামৃতাস্যাম্ তেনাহং কিম্ কুর্যাম্"। মানবকে মর্তলোকে সেই মূর্ত অমৃত দীধিতির সংবাদ আনিয়া দিয়াছিলেন এই বনচরী বল্লবীবালা। ই*হার সংসার ছিল, সমাজ ছিল, গৃহ ছিল, স্বজন ছিল, কিন্তু এই অমৃতের সন্ধানেই তিনি সর্বস্ব বিলাইয়া দিয়াছিলেন। এমন কি বিশ্বকে চরম ও পরম ধর্মাবলম্বনের পথ প্রদর্শন জন্য তিনি সর্বধর্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন। সুখ স্বরূপের বাহুবন্ধনে বন্দিনী ছিলেন, তাই দুঃখবরণে তাহার কুণ্ঠা ছিল না। বহুর মধ্যে সে এক চির বিরাজমান, তাঁহাকে জানিযা- ছিলের চিনিয়াছিলেন এবং পাইয়াছিলেন বলিযাই বহুর বাহুল্য এই দুর্গম পথের অভিসারিকার পথ রোধ করিতে পারে নাই।

এই দেবীর আবির্ভাব রহস্য দুর্জ্ঞেয়। পুরাণে তন্ত্রে নানা ঋষি নানারূপে শ্রীরাধার আবির্ভাব বর্ণনা করিয়াছেন। পুরাণে রাধা বৃষভানু-নন্দিনী। আচার্য নিম্বার্ক এই দেবীকে উপাস্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিম্বার্ক রাধাকে বৃষভানুজাই বলিয়াছিলেন। কাহারো কাহারো মতে দেবী রাসোদ্ভবা শ্রীরাসমণ্ডলেই তাঁহার আবির্ভাব।

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর নাটকে বর্ণিত আছে—কন্যাগৌরবে হিমাচলের সম্মান দেখিয়া বিন্ধ্য পর্বত তপস্যা করিয়া দুইটি কন্যা প্রাপ্ত হন। আবির্ভাবের পরই কন্যা দুইটি সূতিকাগার হইতে অপহৃতা হইলে বিন্ধ্যাচলের পুরোহিত রাক্ষস মারণ মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে রাক্ষসীর অনুসরণ করিলে রাক্ষসী কন্যাদ্বয়কে শ্রীবৃন্দাবনের এক শতদলশোভিত সরোবরে নিক্ষেপপূর্বক পলায়ন করেন। বৃষভানু এবং চন্দ্রভানু এই সরোবরের শতদল-শয্যা হইতেই কন্যা দুইটিকে প্রাপ্ত হন। এই দুইটি কন্যাই শ্রীরাধা ও শ্রীচন্দ্রাবলী।

শ্রীরাধার এক অপরূপ রূপের বর্ণনা করিয়াছেন দাস গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ। ভারতের পুরাণ তন্ত্র কাব্য নাটকের সার সংগ্রহপূর্বক তিনি রাধারূপের বর্ণনা দিয়াছেন প্রেমাম্ভোজ মকরন্দ স্তোত্রে। কবিরাজ কৃষ্ণদাসের শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে এই স্তবের একটি সুন্দর অনুবাদ আছে। আমি সংক্ষেপে তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। বৈষ্ণবাচার্যগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ শক্তি—হ্লাদিনী শক্তি। শ্রীরাধায় এবং শ্রীকৃষ্ণে কোন পার্থক্য নাই। শক্তি ও শক্তিমান উভয়েই অভেদ।

কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনার সংক্ষিপ্ত মর্মার্থ এইরূপ—শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যে স্নেহ তাহাই রাধা অঙ্গের উদ্বর্তন। এই অঙ্গ বিলেপনে তাঁহার দেহ এক দিব্য সৌরভে পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং সমগ্র অঙ্গ অসমোর্ধ্ব ঔজ্জ্বল্য

ধারণ করিয়াছে। কারুণ্যা-মৃতধারায় তিনি প্রাতঃস্নান করেন। তাঁহার করুণাই জগতকে প্রাণবন্ত রাখিয়াছে। তারুণ্যামৃত ধারায় তাঁহার মধ্যাহ্ন স্নান এই কিশোরীর চির-তারুণ্য নির্মেঘ মধ্যাহ্নের মতই ভাস্বর। রাধার সায়াহ্নস্নান লাবণ্যামৃত ধারায়। তাঁহার লাবণ্যই জগতকে সুন্দর করিয়া রাখিয়াছে। স্নানের পর তিনি নিজ লজ্জারূপ শ্যাম পট্ট শাটী পরিধান করিয়া আছেন। কৃষ্ণের প্রতি রাধার যে অনুরাগ তাহাই রক্তবর্ণ উত্তরীয়রূপে শোভা পাইতেছে। প্রণয় এবং মান দুইটিই তাঁহার কঞ্চুলিকা —স্তনাবরণ। শ্রীরাধার সৌন্দর্যই কুমকুমরূপে সখীসমূহের প্রণয় চন্দনরূপে—এবং স্বীয় স্মিত কান্তি কর্পূররূপে স্নানান্তে অঙ্গবিলেপন হইয়াছে। শ্রীরাধার প্রতি কৃষ্ণ-প্রীতিই উজ্জ্বল মৃগমদ, রাধা সেই মৃগমদে সারাদেহ চিত্রিত করিয়াছেন। প্রচ্ছন্নমান এবং বামতাই রাধার কুটিল কেশকলাপ।

অঙ্গে মাখিবার গন্ধচূর্ণ তাঁহার ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরাদি গুণাবলী। রাগই তাম্বুলরাগরূপে রাধার অধর রঞ্জিত করিয়াছে। রাধার দুই নয়নের কাজল তাহার প্রেম-কৌটিল্য।

সুদীপ্ত সাত্বিক ভাব হর্ষাদি সঞ্চারী।
এই সব ভাব ভূষণ সব অঙ্গ ভরি॥
কিলকিঞ্চিতাদি ভাব বিংশতি ভূষিত।
গুণ শ্রেণী পুষ্পমাল্য সর্বাঙ্গ পূরিত॥

অতুলনীয় সৌভাগ্যই তিলকরূপে তাঁহার ললাটকে ঔজ্জ্বল্য দান করিয়াছে। তাঁহার কণ্ঠহারের মধ্যমণি হইল প্রেম-বৈচিত্ত্য। মধ্য-বয়স্থিতি (চির কৈশোর) রূপ সখীর স্কন্ধে তিনি করার্পণ করিয়া আছেন। তাঁহার আশে-পাশে রহিয়াছেন কৃষ্ণলীলা স্মরণ মনোবৃত্তিসমূহ সখীরূপে। নিজাঙ্গ সৌরভ-আলয়ে (শ্রীকৃষ্ণ সোহাগের) গর্ব পর্যঙ্কে তিনি উপবিষ্টা রহিয়াছেন। সেই সুখাসনে সমাসীনা তিনি সর্বদা কৃষ্ণ সঙ্গই চিন্তা করিতেছেন। কৃষ্ণ গুণ যশ শ্রবণই রাধার দুই কর্ণের অবতংস। তাঁহার বদনে সর্বদাই কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা কথার প্রবাহ বহিতেছে। কৃষ্ণকে শ্যামমধুরস পান করাইয়া তিনি কৃষ্ণের সর্ব কামনাই পূর্ণ করিতেছেন। শৃঙ্গার রস বিষ্ণু দৈবত, ইহার বর্ণ শ্যাম। শ্রীকৃষ্ণকে সম্ভোগসুখ দান করেন এই অর্থেই বলা হইয়াছে "কৃষ্ণকে করায় শ্যাম মধুরস পান"।

কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর।
অনুপম গুণ গণে পূর্ণ কলেবর॥

যাহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা।
যার ঠাঁই কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা॥
যার সৌন্দর্যাদি বাঞ্ছে লক্ষ্মী পার্বতী।
যার পাতিব্রত্য ধর্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী॥
যার গুণগণের কৃষ্ণ না পান পার।
তার গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার॥

এই সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্রে মহাভাবময়ীর যে মহিমান্বিতা মূর্তি অঙ্কিত হইয়াছে তাহারই মধ্যে মধুরভাবে ভজনের নিগূঢ় সঙ্কেত নিহিত রহিয়াছে। মানস সঙ্কল্পে ব্রজে বাস করিয়া অন্তশ্চিন্তিত দেহে যে সাধক গোপীভাবে কৃষ্ণ ভজন করিবেন, তাঁহাকে নিজ সিদ্ধ দেহ এইভাবেই সাজাইয়া লইতে হইবে। মধুর ভাবের উপাসকগণ শ্রীরাধার একান্ত আনুগত্যেই তাঁহার দাসীর দাসীরূপে নিজেকে চিন্তা করিবেন। তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতে হইবে শ্রীরাধার করুণা কণায় যেন আমি পরিস্নাত হইতেছি। তাঁহার তারুণ্যের, তাঁহার লাবণ্যের অণুমাত্র প্রসাদ দিয়া তিনি যেন আমার দেহকে শ্রীকৃষ্ণ সেবার যোগ্য করিয়া তুলিতে কার্পণ্য না করেন। শ্রীরাধার করুণায় যেন শ্রীকৃষ্ণ স্নেহের কণিকা মাত্রও পাইতে পারি। এই কামনা লইয়াই নিজ সিদ্ধ দেহকে সংগঠিত করিতে হইবে। মানস গঠিত এই দেহই হইবে শ্রীকৃষ্ণ ভজনের উপযুক্ত আধার। তাই বলিয়া আমি প্রচ্ছন্ন মান ও বামতা, প্রণয় মান কঞ্চুলিকাদি কোন কিছুই চাহিব না। আমি চাহিব কৃষ্ণ নাম গুণ যশ কর্ণভূষণ, আমি চাহিব কৃষ্ণের রূপ, নাম লীলা গুণাদি কথনের অবিচ্ছিন্ন ধারা আমার রসনায়। আর চাহিব শ্রীরাধার চরণোপান্তে রহিয়াই আমি যেন তাঁহারই আদেশানুসারে কৃষ্ণসেবা করিতে পারি।

মধুর ভাবের উপাসনায় সৌন্দর্যের সাধনা প্রয়োজন। চিরসুন্দরের সমীপবর্ত্তী হইবে তুমি। তুমি অন্তরে বাহিরে সুন্দর না হইলে সে অধিকার অর্জন করিবে কিরূপে! তোমার দেহকেও যেমন পবিত্র রাখিতে হইবে, মনকেও তেমনই মালিণ্যমুক্ত করিতে পারিলে তবেই তুমি চিরসুন্দরকে প্রাপ্ত হইবে।

মধুর ভাবের উপাসনা ভালবাসার সাধনা। জগতকে যদি ভালবাসিতে না পার, জগতের নরনারীকে, আব্রহ্ম স্তম্ব স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই জগতকে যদি ভালবাসিতে না পার, তুমি কোন্ মুখে বলিবে আমি কৃষ্ণ দাসী, আমি সেই মাধুর্য বিগ্রহকে ভালবাসি। গোপীভাবের ভজনে লোভ হইয়াছে তোমার। তোমাকেই তো এই জগৎ হইতে হিংসা দ্বেষ দ্বন্দ্ব কলহ দূরীকরণের ভার গ্রহণ

করিতে হইবে। সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল কিশোরের পদপ্রান্তে নিরন্তর প্রার্থনা করিতে হইবে, নরনারীর শুমতি দাও, জগৎ হইতে হিংসা দ্বেষ দূর করিয়া দাও।

আপনি আচরণ করিয়া কায়মনোবাক্যে অকপটে সকলকে ভালবাসিয়া তোমাকে এই গোপীপদাঙ্কিত পথে অগ্রসর হইতে হইবে। এই পথ দুর্গম, এই পথ ক্ষুরধার। এই পথ কাপুরুষের নহে, দুর্বলের নহে। এই ভালবাসার পথে অগ্রসর হইলেই শুনিতে পাইবে—তোমার প্রিয় দয়িতের অভয় বাণী—ক্লৈব্যংমাস্ম গমঃ।

'সোমারে ঘৃৎ লই যা স্বাহা।' পুরোহিত আসিয়াছেন স্বস্ত্যয়ন করিতে যজমান গৃহে। গত দুইদিন শিবপূজা, চণ্ডীপাঠ, শালগ্রাম শিলায় তুলসী দান ইত্যাদি কার্য শেষ হইয়াছে। আজ হোমের দিন। যজমান উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত প্রায় এক সের আনিয়া দিয়াছেন। সে কালে ডালডার নামগন্ধও কেহ শোনে নাই। হৈয়ঙ্গ বীন্ প্রচুর পাওয়া যাইত এ দেশে। প্রায় লোকেই ভেজাল কাহাকে বলে জানিত না। ধর্মভয় ছিল লোকের মনে। বিশেষ হোমের জন্য ঘি-এর দরকার শুনিলেই লোকে সঙ্কুচিত হইত। মনে করিত হয়তো বেশ শুদ্ধভাবে ঘৃত প্রস্তুত করা হয় নাই! বিক্রয় করিতে ভীত হইত। আজকাল গাওয়া ঘি-এর নামে প্রায় আধাআধি ভেজাল চলিয়া যায়।

ঘৃতের বর্ণ এবং গন্ধে পুরোহিতচিত্ত চঞ্চল হইয়াছে। অকারণ অগ্নিতে বিসর্জন দেওয়া অপেক্ষা অন্নের সঙ্গে সেবন করিলে উপকার হইবে, তাই ছাত্রকে আহ্বান। লোকে শুনিলে মনে করিবে ভট্টাচার্য মহাশয় মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন। ছাত্র সোমনাথ এই সেদিন ব্যাকরণতীর্থ হইয়াছেন, বেশ চৌকস ছেলে। তিনি উত্তর দিলেন প্রায় মন্ত্রোচ্চারণের মতই, লব কিস্যে লব কিস্যে নমঃ। পুরোহিত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন—পাছে কেহ আসিয়া পড়ে। বলিলেন, "লব লব ভাণ্ডো পরি স্বাহা।" হিতাকাঙ্ক্ষী ছাত্র জানাইলেন নূতন ভাণ্ড, শোষণের ভয় আছে। জপের ছলে উচ্চারণ করিলেন—শোষ্যতি শোষ্যতি নমঃ।" এবার পুরোহিত রাগিয়া উঠিলেন, হঠাৎ কেহ আসিয়া পড়িতে পারে, অকারণে বিলম্ব হইতেছে। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলেন—তু পিতুঃ কা ক্ষতি স্বাহা।" যাহার নির্গলিতার্থ তোর বাবার কি ক্ষতি!

আমাদের শাস্ত্রে আপ্তবাক্য আছে। কিন্তু আপ্ত বাক্যেরও গূঢ়ার্থ আছে, তাহার মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। বহু আপ্তবাক্যের দার্শনিক বিচারের সমর্থন আছে। তাছাড়া অধিকাংশ শাস্ত্র-বাক্যের মধ্যে যেমন তত্ত্ব আছে, তেমনই

তথ্যও আছে, যুক্তিও আছে। শাস্ত্র ধমক দিয়া সর্বক্ষেত্রেই বলেন না, "তু পিতুঃ কা ক্ষতি স্বাহা"।

আধুনিক পণ্ডিতগণ অনেকেই শ্রীকৃষ্ণকে ঐতিহাসিক পুরুষ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা কল্পনা করেন শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের সঙ্গে লোক প্রচলিত গীতি গাঁথার মিশ্রণ ঘটিয়াছে এবং তাহার মধ্যে প্রাচীন আভীর জাতির জাতিগত প্রথা-পদ্ধতিও মিশিয়া গিয়াছে। ইহারা শ্রীরাধাকে স্বীকার করিতে চাহেন না। সাম্প্রদায়িক বিরোধ অস্বীকার করি না। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখিয়াছি একটি পুরাণ বা উপ-পুরাণ অন্য পুরাণ বা উপ-পুরাণের পরিপূরক। ইহারা অনুসন্ধান করেন না, প্রক্ষিপ্তবাদের দোহাই দিয়া নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। সেই সঙ্গে সকল গণ্ডগোলের অবসান ঘটাইয়া জটিলতার বেড়া ডিঙাইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন। সমস্ত বোঝা হাল্কা করিয়া ফেলেন।

সম্প্রতি একজন গবেষক নিম্বার্ক দর্শন সম্বন্ধে আলোচনাপূর্বক ডি ফিল ডিগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন। নানা যুক্তি তর্ক প্রয়োগে বহু নূতন প্রামাণ্য তথ্যের আলোকে তিনি আচার্য নিম্বার্কদেবকে আচার্য শঙ্করেরও পূর্ববর্তী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিযাছেন। আচার্য নিম্বার্ক একজন সম্প্রদায় প্রবর্তকরূপে ভারত বিখ্যাত। দার্শনিক মতবাদে তিনি দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। বেদান্ত ভাষ্যে তিনি এই মত প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। ইহা ভেদাভেদবাদ নামে পরিচিত। প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য চন্দ্র এই ভেদাভেদবাদ গ্রহণ করিয়া বলিযাছিলেন ইহা অচিন্ত্য। এই জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদী নামে পরিচিত।

সে আজ অনেক দিনের কথা। প্রয়াগধামে মহাকুম্ভে উপস্থিতির সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। মেলাক্ষেত্র নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের আচার্য শ্রীল সন্ত দাস ব্রজবিদেহীর শুভ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলাম। তিনিও আচার্যদের সম্বন্ধে প্রাচীনত্বের সিদ্ধান্তই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে নিম্বার্কের আবির্ভাব হইয়াছিল স্মরণাতীত কালে। যাহা হউক, এখন এই সিদ্ধান্ত প্রায় নির্বিবাদ যে, আচার্য নিম্বার্ক অন্ততঃ দেড় হাজার বৎসর পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। নিম্বার্কদেব শ্রীকৃষ্ণকে উপাস্য এবং শ্রীরাধাকে উপাস্যারূপে বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বেদান্ত দশশ্লোকী গ্রন্থে পাইতেছি—

অঙ্গেতু বামে বৃষভানুজাং মুদা
বিরাজমানা মনুরূপ সৌভগাম্।

সখী সহস্রৈঃ পরিসেবিতাং সদা
স্মরেম দেবীং সকলেষ্ট কামদাম্ ॥

এই বৃষভানু তনয়াকে নিম্বার্ক কোথা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ?

একজন সম্প্রদায় প্রবর্তক আচার্য প্রামাণ্য শাস্ত্রে না পাইলে কোন এক স্থানের লৌকিক গীতি গাথা কিম্বা লোক প্রচলিত ধর্মের মধ্য হইতে আপন উপাস্যকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ যুক্তি একান্তই অশ্রদ্ধেয়। বহু শাস্ত্রগ্রন্থ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর অত্যাচারে বহু গ্রন্থ নষ্ট হইয়াছে। পঞ্চরাত্র আগমের অনেক গ্রন্থই এখন আর পাওয়া যায় না। পুরাণ উপ-পুরাণেরও অনেক অংশ বিলুপ্ত হইয়াছে।

স্বর্গগত পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে প্রায় তেত্রিশ শত বৎসর পূর্বে বেদাঙ্গ জ্যোতিষ সংকলিত হইয়াছিল। স্বর্গগত ডাঃ একেন্দ্রনাথ ঘোষ আমাকে বলিয়াছিলেন—যাজুস্ জ্যোতিষের সপ্তম শ্লোক হইতে অনুমিত হয়—বেদাঙ্গ জ্যোতিষ সঙ্কলিত হইয়াছিল প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্বে। তাহারও পূর্বে মহাবিষুব সংক্রান্তি যখন কৃত্তিকা নক্ষত্রের নিকটস্থ ছিল, সেই সময়েই প্রায় চারি হাজার পাঁচ শত বৎসর পূর্বে বৈদিক ঋষিগণ সমুদয় নক্ষত্রের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিলেন।

অথর্ব বেদে (১৯৷৭৷৩) বিশাখা নক্ষত্রের অপর নাম রাধা। 'রাধে বিশাখে সুহবানুরাধাহ্ন জ্যেষ্ঠা সুনক্ষত্রমরিষ্ট মূলম্'। বিশাখা নক্ষত্রের পরের নক্ষত্রের নাম অনুরাধা। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বিশাখাদ্বয়কে নক্ষত্রগণের অধিপত্নী ও ভুবনের শ্রেষ্ঠা গোপী বলা হইয়াছে।

নক্ষত্রানামধিপত্নী বিশাখে। শ্রেষ্ঠ্য বিন্দ্রগ্নী ভুবনস্য গোপৌ। (৩৷১৷১৷১১)

উল্লিখিত শ্লোক দুইটী হইতে জানা যায় চারি হাজারও বৎসরের পূর্বে রাধানাম এবং গোপী শব্দ অজানা ছিল না। দেড় হাজার বৎসর পূবে মহাকবি কালিদাস (মেঘদূতে) গোপবেশ বিষ্ণুর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কবির রঘুবংশ হইতে জানিতে পারি কবি বৃন্দাবনের কথা, গিরি গোবর্ধনের কথা বিশেষরূপেই জানিতেন। মহাকবি ভাসকে অনেকেই খৃষ্ট জন্মের পূবর্তী কালের কবি বলিয়াই মনে করেন। ভাসের বাল চরিত নাটকে গোপী কথা আছে। অন্ধ্র ভৃত্য-বংশীয় নরনাথ হালকে কেহ বলেন খৃষ্ট জন্মের পূর্বে তিনি দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করিতেন। কেহ বলেন, হাল নরপতি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে বর্তমান ছিলেন। হালের নিয়োজিত পণ্ডিতগণ প্রাকৃত ভাষায় রচিত সাত শত উৎকৃষ্ট গাথা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সংগৃহীত গাথাসমূহ সঙ্কলিত হয়

হালের নামে—হালা সপ্তশতী বা গাথা সপ্তশতী। অধিকাংশ গাথাই প্রাচীন কবিগণের রচিত। সম-সাময়িক কবিগণের রচিত কিছু সংখ্যক গাথা যে গাথা সপ্তশতীতে স্থান পাইয়াছে, সেই বিষয়ে কোন সংশয় প্রকাশ না করিয়াও বলা যায় বহু গাথার রচনাকাল আড়াই হাজার বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। আমি যে গাথাটি উদ্ধৃত করিতেছি তাহার বয়স দুই হাজার বৎসর অনুমান করিলে অন্যায় হইবে না।

অজ্জবি বালো দামোঅরোত্তি ই অ
জপ্পি অই যসোআএ।
কন্‌হ মুহ পেসিঅচ্ছং নিলুঅং
হসিঅং বজবহুহিং ॥

শ্লোকটীর সংস্কৃত রূপ—

অদ্যাপিবালো দামোদর ইতি
ইহ জল্প্যতে যশোদয়া ॥
কৃষ্ণ মুখ প্রে ষতাক্ষং নিভৃতং
হসিতং ব্রজবধূভিঃ ॥

আমার দামোদর এখন বালক। যশোদার মুখে এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণের মুখ পানে চাহিয়া ব্রজবধূগণ নিভৃতে হাসাহাসি করিতেছেন।

বহু জননী প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে দেখিয়া সোহাগ করিয়া বলেন, আমার খোকা এখনো ছেলে মানুষ। দেখ্‌তেই না হয় মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে ইত্যাদি। যশোদার এই কথা কিন্তু সে ধরণের উক্তি নহে। দামোদর এখনো বালক, সত্যই বালক। কিন্তু এই বালক যে নিত্য কিশোর, ব্রজবধূগণ নিত্যই সে পরিচয় পাইয়া থাকেন। তাই কৃষ্ণের মুখপানে চাহিয়া তাহারা হাসিয়াছিলেন। এই শ্লোকের ব্যঞ্জনায় কৃষ্ণলীলার সমগ্র ঐতিহ্য স্বপ্রকাশ রহিয়াছে। কত বয়সে কৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবন ত্যাগ করিয়াছিলেন বহু পুরাণে তাহার বর্ণনা আছে। শ্রীকৃষ্ণ যে নন্দনন্দন, যশোদার দুলাল, এ সংবাদ গাথা রচয়িতা জানিতেন ; তিনি জানিতেন কৃষ্ণের ঐশ্বর্য ও মাধুর্য সমৃদ্ধ বাল্যলীলার সংবাদ। জানিতেন ব্রজবধূগণের সঙ্গে রাসবিলাসের সংবাদ। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে এ কথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে, গাথা সপ্তশতীর এই গাথা রচনাকালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথার বহুল প্রচার ছিল।

এই গাথা সপ্তশতীর মধ্যেই অপর একটী গাথা আছে, যাহার মর্ম—কৃষ্ণ, তুমি মুখ মারুতের দ্বারা রাধিকার বদনমণ্ডল হইতে গোক্ষুর ধূলি অপনোদন-

পূর্বক অন্যা গোপীগণের গৌরব হরণ করিয়াছ। কৃষ্ণ ধেনু বৎস লইয়া রাখালগণ সহ গোষ্ঠ হইতে শ্রীবৃন্দাবনে নন্দ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। শ্রীরাধা রাজপথে দাঁড়াইয়া সেই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। গোক্ষুরোত্থিত ধূলি লাগিয়াছিল শ্রীরাধার মুখ কমলে। পীত ধড়ার অঞ্চলে নয়, উত্তরীয় প্রান্ত দিয়া নয়, সুকোমল করকমলাবঘর্ষণে নয়, তুমি ফুৎকার দিয়া সেই ধূলি অপসারণ করিতে গিয়া সর্ব গোপী সমক্ষেই শ্রীরাধার মুখ চুম্বন করিয়াছ, ইহাই এই শ্লোকের ব্যাঞ্জনা। ইহাতে অন্যা গোপীগণের গৌরব গিয়াছে। এই গাথায় যেভাবে রাধা প্রেমের উৎকর্ষ প্রকাশিত হইয়াছে, প্রাচীন যুগের সংস্কৃত কবিগণের এবং মধ্যযুগের বাঙ্গালা বৈষ্ণব পদরচয়িতগণের সঙ্গেই তাহার তুলনা করিতে পারি।

দেড় হাজার বৎসর পূর্বে সঙ্কলিত পঞ্চতন্ত্রে গোপকুলপ্রসূতা শ্রীরাধার নাম আছে। বারশত বৎসর পূর্বে কবি ভট্ট নারায়ণ বেণী-সংহারে শ্রীরাধার অনুসরণরত কংসারির আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়াছেন। কবীন্দ্র বচন সমুচ্চয়ে, ক্ষেমেন্দ্রের দশাবতার চরিতে রাধানাথ বন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীজয়দেব এবং বিল্বমঙ্গল রাধা পারম্যবাদের কবি। নানাদিক দিয়া আলোচনা করিয়া এই কথাই স্বীকার করিতে হয় যে, আচার্য নিম্বার্কদেব নিশ্চয়ই কোন প্রামাণ্য শাস্ত্র হইতেই শ্রীরাধাকে উপাস্যারূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আচার্য নিম্বার্ক দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন। সুতরাং স্বীকার করিতে হয়, শ্রীবৃন্দাবনের সংবাদ এবং সেই সঙ্গে শ্রীরাধার প্রেম-মুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণের সংবাদ দাক্ষিণাত্যেও অজ্ঞাত ছিল না। উত্তর ভারত এবং পূর্ব ভারতেও শ্রীরাধা সমান সমাদৃতা। দুঃখের বিষয় আজি পর্যন্ত কেহ এই প্রেম ধর্মের মূল উৎসের সন্ধান দিতে পারিলেন না। গ্রন্থে, শিলালেখে, শিলাচিত্রে তাম্র শাসনে যে নির্দর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দুই হাজার বৎসর পূর্বেই শ্রীরাধার পুণ্যাবির্ভাবের দিব্য সংবাদ স্বীকৃত হইয়াছে। অনুসন্ধান করিলে তাহারও পূর্বে এই দেবীর অধিষ্ঠান ভূমি এবং আবির্ভাব তিথি আবিষ্কৃত হইতে পারে।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা

ছান্দোগ্য উপনিষদে একটি উপাখ্যান আছে। সংক্ষেপে বলিতেছি। দেবর্ষি নারদ ভগবান সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইলেন। উদ্দেশ্য পরম-তত্ত্বের স্বরূপ কি তাহাই জানা। সনৎকুমার বলিলেন তুমি কোন কোন বিষয় জান?

নারদ বলিলেন, ভগবান, আমি ঋগ্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস ও পুরাণ শিক্ষা করিয়াছি। বৈদিক পদ নিষ্পাদক ব্যাকরণ শ্রাদ্ধ পদ্ধতি ও গণিত শাস্ত্রও আমি জানি। অনিষ্টসূচক উৎপাৎজ্ঞাপক শাস্ত্র রত্নবিজ্ঞান তর্কবিদ্যা এবং শিক্ষা কল্পাদি, বেদের ষড়ঙ্গও অধিগত করিয়াছি। ভূতবিদ্যা, ধনুর্বিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, দেবজনবিদ্যাও আমার জানা আছে। আমি জ্যোতিষ শাস্ত্রও জানি।

সনৎকুমার বলিলেন, এ সমস্তই নামমাত্র। নারদ নিবেদন করিলেন, নামের পরে কি আছে বলুন।

সনৎকুমার বলিলেন নামকে ব্রহ্মবুদ্ধিতে উপাসনা করিবে। ব্রহ্মবুদ্ধিতে নামের উপাসনা উপনিষদের উপদেশ। সুতরাং শ্রীভগবানের নাম যে পরম উপাস্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 'বিষ্ণু সহস্র নাম স্তোত্র' আমরা শাস্ত্র হইতেই পাইয়াছি। শ্রীমন মহাপ্রভু বলিয়াছেন নাম হইতেই সর্বানর্থনাশ ও সর্বশুভোদয় হয়। কৃষ্ণনামের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কোন পার্থক্য নাই। অবশ্য সনৎকুমারের উপদেশ এবং শ্রীমহাপ্রভুর উপদেশে অর্থের বিভিন্নতা আছে। আমরা এখানে বাহ্যিক সঙ্গতির জন্য প্রসঙ্গত বিষয়টির উল্লেখ করিলাম।

সনৎকুমার নামের পর বাকের উপাসনা করিতে বলিয়াছেন। বাকের পর মন, মনের পর সংকল্প, সংকল্পের পর চিত্ত, চিত্তের পর বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের পর বল, অর্থাৎ প্রতিভা উদ্যম ও অধ্যবসায়ের উপাসনার কথা বলিয়াছেন সনৎ-কুমার। সনৎকুমার বলিয়াছেন—বলের পর অন্ন, অন্নের পর জল, জলের পর তেজ, তেজের পর আকাশ, আকাশের পরে স্মরকে ব্রহ্মজ্ঞানে উপাসনা করিবে।

উপনিষদের অপর নাম রহস্যবিদ্যা। উপনিষদের অর্থ গুরু-মুখ-বেদ্য। সেই গুরু পরম্পরা বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন আমরা যাহা অর্থ করি সমস্তই কাল্পনিক। সে অর্থ অনুভূতিগম্য নহে বুদ্ধির কসরতে আবিষ্কৃত। উপনিষদ এখানে স্মৃতি অর্থে স্মর শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। স্মৃতি যে একান্তই রক্ষণীয়

গীতা তাহা বলিয়াছেন—স্মৃতি ভ্রংশাৎ বুদ্ধি নাশো বুদ্ধি নাশ্যাৎ পনশ্যতি—স্মৃতি এমনই অমৃতময় বস্তু। স্মর কাম নামেও পরিচিত। কিন্তু সে অপর এক রহস্য। সনৎকুমার স্মরের পরে আশার উপাসনার কথা বলিয়াছেন। বলিয়াছেন, আশা অপেক্ষা প্রাণ শ্রেষ্ঠ।

সনৎকুমার বলিলেন সত্য স্বরূপই বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য। নারদ নিবেদন করিলেন, ভগবন, আমি সত্যকেই জানিতে ইচ্ছা করি। বিশেষরূপে না জানিয়া কেহ সত্য বলে না তজ্জন্য নারদ বলিলেন, আমি বিজ্ঞানকেই জানিতে ইচ্ছা করি। সনৎকুমার বলিলেন, মনন না করিলে বিজ্ঞানকে জানা যায় না। নারদ বলিলেন, আমি মতিকেই জানিতে চাই। (এখানে মতি শব্দটি লক্ষণীয়) সনৎকুমার বলিলেন, শ্রদ্ধাহীনের মতি হয় না। (স্মরণীয় গীতার 'শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম')। নারদ বলিলেন, আমি শ্রদ্ধাকেই জানিতে চাই। সনৎকুমার বলিলেন, নিষ্ঠাহীন ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান হয় না। নারদ নিষ্ঠাকেই জানিতে চাহিলেন। সনৎকুমার উত্তর দিলেন পুরুষ যখন ইন্দ্রিয় সংযমাদি বিষয়ে চেষ্টা করে তখনই নিষ্ঠা লাভ করে। আবার যদি আনন্দ না পায়—তাহা হইলে মানুষ কেন ইন্দ্রিয় সংযমে চেষ্টা করিবে? নিরতিশয় আনন্দ লাভ করে বলিয়াই লোকে ইন্দ্রিয় সংযমে যত্নপর হয়। পরন্তু সুখ লাভ হয় বলিয়াই না মানুষ ইন্দ্রিয় সংযমে প্রযত্ন করে। অতএব সুখই অন্বেষ্টব্য। নারদ বলিলেন, সুখ কি? সনৎকুমার বলিলেন 'ভূমৈব সুখং। নাল্পে সুখমস্তি।

গীতায় শ্রদ্ধাবানের পরই সংযতেন্দ্রিয়ের কথা বলা হইয়াছে। এখানে নিষ্ঠার পর ইন্দ্রিয় সংযমের প্রসঙ্গ আসিয়াছে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে কবিরাজ কৃষ্ণদাস নবাঙ্গ ভক্তি সাধনার কথায় বলিয়াছেন—

> এক অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু অঙ্গ।
> নিষ্ঠা হইলে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ।

বিষয় বিনিবৃত্ত চিত্ত সাধক সুখ না পাইলে কখনই কঠোর ইন্দ্রিয়াদি সংযমে প্রবৃত্ত হইতেন না। শুধু মানুষ কেন সর্বপ্রাণীই সুখের জন্য লালায়িত। কিন্তু শাস্ত্র বলিতেছেন, সাধক নিজের জীবনাদর্শে দেখাইয়াছেন—লৌকিক বিষয়-সুখ পরিণাম বিরস ক্ষণভঙ্গুর নিতান্তই ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু প্রকৃত সুখ দেশ কালের সীমাতীত। দেশ ও কালের ব্যবধানে তাহার কোন পরিবর্তন ঘটে না, সে সব আস্বাদনের তারতম্যও হয় না। এই জন্যই উপনিষদ সুখকে ভূমা বলিয়াছেন, বলিয়াছেন—অল্পে সুখ নাই। বৈষ্ণব কবি

আরো উপরে উঠিয়া উপনিষদের সার নির্যাস জানাইতেছেন—'অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব' শ্রীকৃষ্ণই সুখ-স্বরূপ। তিনিই আস্বাদ্য। তিনিই আস্বাদক। তিনিই আস্বাদন। কবিরাজ গোস্বামী ভূমারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন।"

ভগবান সনৎকুমার সত্য স্বরূপের দ্বারোদ্‌ঘাটনে প্রকোষ্ঠের পর প্রকোষ্ঠ অতিক্রমপূর্বক যেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, কবিরাজ গোস্বামী সেইখানে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণই সুখ স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণই ত্রিকাল-সত্য।

শ্রীল কবি কর্ণপুর অলঙ্কার কৌস্তভে বলিয়াছেন—অন্তর বহিরিন্দ্রিয় সম্বন্ধে ব্যাপারান্তরের রোধক প্রতিবন্ধক, অর্থাৎ বেদ্যান্তর স্পর্শশূন্য কারক, অথচ স্বকারণীভূত বিভাবাদির সহিত সম্মেলনে চমৎকার জনক—এই যে সুখ তাহাই রস। চমৎকৃতি না থাকিলে রসও হয় না, সুখও হয় না।

সনৎকুমার মতি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার কথা বলিয়াই সুখের উল্লেখ করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিগণও শৌচ সদাচার এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহের কথা বার বার বলিয়াছেন। উপরন্তু বলিয়াছেন—নিজে আনন্দিত হও, আনন্দ আস্বাদন কর, আনন্দ বিতরণ কর। আনন্দ স্বরূপকে লাভ করিয়া একেবারে সম্পূর্ণরূপে আনন্দময় হইয়া যাও। দেখিবে দেশ ও কালের গণ্ডী অতিক্রান্ত হইয়া তুমি প্রত্যক্ষ করিতেছ "ভূমৈব সুখং। নাল্পে সুখমস্তি।"

যাহা ভূমা, তাহাই অমৃত! যাহা অল্প তাহাই মর্ত, মরণশীল। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ভূমার স্থিতি কোথায়? সনৎকুমার বলিলেন, 'স্বে মহিম্নি' আপন মহিমায়! পরক্ষণেই বলিলেন, তাঁহার মহিমার কথা বলিলাম কিন্তু তিনি আপন মহিমারও ঊর্ধ্বে।

মহর্ষি দেবর্ষিগণেরও শিক্ষাগুরু পরম মহানুভব শ্রীস্বরূপ দামোদর কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের আবির্ভাব রহস্যের উৎস সন্ধানে গিয়া বলিয়াছেন —শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা! শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা কেমন? আমার যে অদ্ভুত মাধুর্য শ্রীরাধা আস্বাদন করেন সেই মাধুর্য কেমন? আমার মাধুর্য আস্বাদন-পূর্বক শ্রীরাধা যে সুখ পান, সেই সুখই বা কেমন? এই তিনটি অপূর্ণ বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গের অবতার গ্রহণ।

আমার আলোচ্য বিষয়—'শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা।' শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিতে

ইচ্ছা হয়—তাহা হইলে শ্রীরাধার প্রণয় মাধুর্য তুমি শ্রীধাম বৃন্দাবনে আস্বাদন করিয়াছিলে ? রাধা প্রেমের মহিমাই উপলব্ধি করিতে পার নাই। এদিকে তো নিজের মাধুর্য্যের কথাই বলিতেছ, কই মহিমার কথা তো বলিলে না ? শ্রীধাম নবদ্বীপে আসিয়াছিলে শ্রীরাধার প্রেমের পরিমাপ করিতে। শ্রীরাধা তোমার হ্লাদিনীশক্তি, তিনি তোমার মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াই সুখ পান—তাহা হইলে সুখস্বরূপ কৃষ্ণ তুমিই একা সুখ আস্বাদন কর না। তোমার সুখ স্বরূপিণীও সুখ আস্বাদন করেন। শোন বন্ধু,

'দোঁহার যে সমরস ভারত মুনি মানে,
আমার ব্রজের রস সেহ নাহি জানে।'

এই উক্তি কাহার ?

শ্রীরাধার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ সে তো অনাদিকালের, তোমরা তো একাত্মই ছিলে, রস আস্বাদনের জন্যই পৃথক হইয়াছ। শ্রীরাধা তোমারই প্রণয় বিকৃতি—অর্থাৎ প্রণয়ের বিশেষ রূপ আকৃতি, সুতরাং তোমাদের পার্থক্য কোথায় ?

তুমি যেমন সর্ববন্ধনের অতীত, তিনিও তেমনি সর্ব বন্ধন ছিন্ন করিয়াই তোমাকে বন্দী করিয়াছেন।

স্বেচ্ছাবন্দিনীর বন্দী তুমি, একান্ত অধীন তুমি, অনুগত দাস তুমি। এই প্রেমই তো ভূমা। কোন দেশ ও কালের গণ্ডীতে ইহা সীমাবদ্ধ নহে। এই জন্যেই এ প্রেম মহিমাময়। অর্থাৎ এই প্রেমের মহিমার প্রতিরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং। শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধার প্রেমের প্রতিমার মূর্ত বিগ্রহ। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—'হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমসার ভাব। ভাবের পরমাকাষ্ঠার নাম মহাভাব। মহাভাব স্বরূপিণী রাধাঠাকুরাণী। সর্বগুণমণি কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি। এই যে শক্তির পরমোৎকর্ষ ইহা যেমন শক্তির তেমনই শক্তিমানের মহিমার পরিচায়ক। এখানে শক্তিমানের স্বতন্ত্র সত্বা থাকিলেও শক্তিমানের সঙ্গে শক্তির নিকট সম্বন্ধের কোন ইতর বিশেষ ঘটে নাই। আমার মনে হয় শ্রীকৃষ্ণ নিজেই যেমন নিজের মহিমার অন্ত পান না, তেমনই শ্রীরাধারও প্রণয় মহিমার সম্যক তাৎপর্যও বুঝিতে পারেন না।

শ্রীরাধার প্রেমও প্রতিষ্ঠিত স্বে মহিম্নি।' এবং মহিমার উপরও তাহার অবস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ একবার বলিয়াছেন—'রাধিকার প্রেমগুরু আমি শিষ্য নট।'

আবার অন্যত্র গোপীগণের কথায় বলিয়াছেন—

সহায়ঃ গুরবো শিষ্যা ভূজিষ্যা
বান্ধবা স্ত্রিয়ঃ
সত্যং বদামি তে পার্থ
যোগ্য কি মে ভবন্তিনঃ।

অন্য একখানি উপনিষদে ব্রহ্মাস্বাদের ক্রমিক পারম্পর্য বর্ণিত আছে। তাহাতে বলা হইয়াছে—অন্নময় কোষ, মনোময় কোষ, প্রাণময় কোষ এবং বিজ্ঞানময় কোষ অতিক্রমপূর্বক আনন্দময় কোষে উপস্থিত হইতে হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে ভগবান সনৎকুকার আরো বিস্তৃত ও সহজবোধ্য ভাবে সেই একই কথা সর্বসাধারণের সাধনের উপযোগীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। নিবিষ্টভাবে পর্যালোচনা করিলে ইহার বৈশিষ্ট্যও বুঝিতে পারা যায়। ভগবান সনৎকুমার মানবের চরম ও পরম সাধ্য আস্বাদিত আনন্দের কথাই বলিয়াছেন। আনন্দ শ্রীবৃন্দাবনেই আস্বাদিত হইয়াছিলেন। যাঁহারা আস্বাদন করিয়াছিলেন তাঁহাদেরই শিরোভূষণ শ্রীরাধার ভাব এবং কান্তি গ্রহণপূর্বক আনন্দ স্বরূপই এবার আনিয়াছেন মানবকে এই সুদুর্লভ অমৃতের আস্বাদ দানের জন্য। এই আগমনও শ্রীরাধার প্রণয় মহিমার পরিচয়ই প্রকাশ করিতেছে। এই আনন্দ এবং সুখতত্ত্ব উপনিষদেও যেমন বৈষ্ণব সাহিত্যেও তেমনই সুষ্ঠুরূপেই সুপ্রকাশিত রহিয়াছে। মূলে অছে শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা। প্রতিপাদ্যও শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা।

গোপী কথা

গোপী কথা,—গোপীগণের স্বার্থ-গন্ধহীন—অপ্রাকৃত-অহৈতুকী প্রেমের কথা—বৃন্দাবন-কেলি-বার্তা কোন্ মহানুভব এ জগতে কোন্ স্মরণাতীত মাহেন্দ্র মুহূর্তে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন জানি না। তিনি যে-ই হউন,—তিনি নিত্য স্মরণীয়, প্রাতঃস্মরণীয়; তাঁহাকে প্রণাম, পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

গুপ্ত রাজাগণ বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহাদের সময়েই চতুর্ভুজ বাসুদেব মূর্তির পূজা বহুল পরিমাণে প্রসার লাভ করে। কিন্তু মহাকবি কালিদাস শ্রীবৃন্দাবনের সংবাদ জানিতেন। রঘুবংশে ইন্দুমতী স্বয়ংবর সভায় সে বার্তা শুনিয়াছে। তিনি মেঘদূতে চতুর্ভুজ বাসুদেব মূর্তির পরিবর্তে ময়ূর-পুচ্ছ শোভিত গোপবেশ বিষ্ণুকে দর্শনের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ের কিছু পূর্বে নির্মিত পাহাড়পুর স্তূপে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার মূর্তি নিচয়ের মাঝখানে যে যুগলমূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহা যে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। যাহারা ঐ মূর্তি সত্যভামা বা রুক্মিণীর মূর্তি বলিতে চাহেন, তাঁহারা বিচার করেন না যে, বৃন্দাবন লীলার মধ্যে সত্যভামা বা রুক্মিণীর স্থান নেই।

আমি দাক্ষিণাত্যের পথে সীমাচলমে কৃষ্ণমূর্তি এবং মধ্য-ভারতের খাজুরাহোতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি দেখিয়া আসিয়াছি। বংশীধারী কৃষ্ণের বামে শ্রীরাধা। মহাবলীপুরে গোবর্ধন ধারণের শিলাচিত্র আছে। পাশেই গোপীমণ্ডলী। এই মণ্ডলী মধ্যবর্তিনী এক গোপী শ্রীকৃষ্ণের গৌরবে অভিভূতা হইয়া প্রায় কৃষ্ণ-অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া স্মিত সোহাগের আবেগে দাঁড়াইয়া আছেন। ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার এই গরবিনী গোপীকে শ্রীরাধা নামে অভিহিত করিয়াছেন। রাঢ় দেশের মঙ্গলকোটেও পুরানো এক মসজিদ গাত্রে চিত্রিত ইষ্টকে কৃষ্ণলীলার অঙ্কন পাওয়া গিয়াছে। ললিত-কলায় কাব্যে নাটকে ভাস্কর্যে ইহার প্রথম চরণক্ষেপের শুভলগ্ন আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই।

দাক্ষিণাত্যের নরপতি হাল—সাত শত প্রাকৃত গাথা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। নানাজনের রচিত নানা রসের সুভাষিতাবলী। তাহার মধ্যে সুস্পষ্টরূপে রাই ও কানুর নাম আছে। শ্রীযুক্তা যশোদা ও অন্ত গোপীর কথা আছে। হাল সপ্তশতীর নামে উদ্ধৃত একটি শ্লোক পাইয়াছি উজ্জ্বল নীলমণিতে। এই শ্লোকটিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রথম মিলনের চিত্র আছে।

শ্লোকটি কিন্তু মুদ্রিত-সপ্তশতী মধ্যে পাওয়া যায় না। অন্ধ্র ভৃত্যবংশীয় এই নরপতি হালকে পণ্ডিতগণ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতকের রাজা বলিতে চাহেন। আমার উদ্দিষ্ট শ্লোকগুলি কাহার দ্বারা রচিত কেহ জানে না। হালের সমকালীন কোন কবির রচনা হইলেও হইতে পারে, এই অনুমান আমি স্বীকার করি না। আমার মনে হয়—এই সমস্ত শ্লোক খৃষ্ট পূর্বাব্দে রচিত। বহুল প্রচারিত এবং রসোত্তীর্ণ বলিয়াই হালের নিয়োজিত পণ্ডিতগণ সেগুলি রাজকীয় সংকলনে গ্রহণ করিয়াছিলেন। হালের একটি শ্লোকের ছবি এইরূপ——শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। শ্রীরাধা সেই মনোরম দৃশ্য দেখিতেছিলেন। শ্রীরাধার বদনমণ্ডলে গোক্ষুর ধূলি লাগিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ মুখ মারুতে অর্থাৎ ফুৎকার দিয়া গোপীগণ সমক্ষেই সেই ধূলি অপনোদন ছলে শ্রীরাধাকে চুম্বন করিয়াছিলেন। ইহাতে অন্য গোপীগণের গৌরব অপহৃত হইয়াছিল। আমি শ্লোকটীর ব্যঞ্জনাবেদ্য অর্থ ধরিয়াই এই ব্যাখ্যা লিখিলাম। বুঝিতে পারি দুই হাজার বৎসর পূর্ব হইতেই শ্রীরাধা প্রেমের এই উৎকর্ষ কবিগণকে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

রাঢ়ে বাঁকুড়া জেলায় শুশুনিয়া পাহাড়ের নিকটবর্তী পরগণার অধিপতি চন্দ্রবর্মার একটি দেড় হাজার বৎসরের শিলালেখ আছে। এই চন্দ্রবর্মা চক্রস্বামী বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। কোনই সন্দেহ নাই—ইনিই দিগ্বিজয়ী গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। কবি ধোয়ী রাঢ় দেশে কমলা কেলিকার মুরারির মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন পবন দূতে। এই সময়ের কবি জয়দেব রাধা পারম্যবাদের কবি। তিনি একটা নূতন কথা বলিয়াছেন। কৃষ্ণ রাধার নাম ধরিয়াই মুরলীতে সংকেত গান করেন—"নাম সমেতং কৃত সঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্। জয়দেবের পূর্বে আমরা এ কথা আর কাহারো নিকট হইতে জানিতে পারি নাই। আশ্চর্যের বিষয় জয়দেবের কিছু পূর্বেই দাক্ষিণাত্যে একজন রাধাপ্রেমের উদ্গাতা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কবির নাম শ্রীবিল্বমঙ্গল। ভক্ত রসিক সমাজে পরিচয় লীলা শুক। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়—বিল্বমঙ্গল কৃষ্ণকে বলিয়াছেন 'শৃঙ্গার রস সর্বস্ব'। আর জয়দেব বলিতেছেন—'শৃঙ্গার সখী মূর্তি মানিব মধৌ মুগ্ধং হরি ক্রীড়তি'। কোথায় দাক্ষিণাত্য আর কোথায় উত্তর ভারত। উজ্জ্বল রস-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছেন বিভিন্ন সময়ে দুইজনে।

শ্লোক আছে—'উৎপন্না দ্রাবিড়ে ভক্তি'।

দাক্ষিণাত্যের আড়বারগণ ইতিহাস প্রসিদ্ধ। ইহারা লক্ষ্মী-নারায়ণের

স্তুতি গায়ক। কিন্তু ইহাদের স্তবে গোপী প্রেমেরও পরিষ্কার চিত্র আছে। আড়বারগণ মধ্যে রমণীমণি অণ্ডালের নাম অতি পরিচিত। আড়বারগণের মধ্যে এক রাজেশ্বর ছিলেন নাম কুলশেখর। ইহার রচিত মুকুন্দমালা স্তোত্র বাঙ্গালাতেও আজিও অনেকে নিত্য পাঠ করেন। মুকুন্দমালার শ্লোক সদুক্তি কথামৃতে ধরা আছে। বুঝিতে অসুবিধা নাই কুলশেখর সম্রাট লক্ষ্মণ সেনের পূর্ববর্তী এবং তাঁহার রচিত শ্লোক বাঙ্গালাতে বহুল প্রচলিত ছিল। এবং সেই সমস্ত শ্লোক লক্ষ্মণ সেনের মহাসামন্ত বটু দাসের পুত্র শ্রীধর দাস আপন সুভাষিত সংগ্রহ সদুক্তি কথামৃতে সঙ্কলনের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিলেন। আমি বিস্মিত হই মুকুন্দমালা স্তোত্রে যখন পাঠ করি—"মা মে স্ত্রীত্বং" আমাকে রমণী করিও না—এ কেমন প্রার্থনা। দাক্ষিণাত্যে অণ্ডাল তো সর্বজন পূজনীয়া। আড়বারগণের রচিত স্তোত্রে রমণীরূপে ভগবদ্ ভজনের বহু শ্লোক আছে। তবে এ প্রার্থনা কেন? এ দিকে শ্রীশুকদেবের নামে প্রচলিত মধুসূদন স্তোত্রে পাইতেছি—

যত্র যত্র চ জাতোহস্মি স্ত্রীষু বা
পুরুষে সু চ।
তত্র তত্রাচলা ভক্তি সুগ্রাহি মাং
মধুসূদনং'।

নারী বা পুরুষ যে কূলেই জন্মি না কেন—তোমার পায়ে অচলা ভক্তি দিও মধুসূদন। আজি পর্যন্ত এই সমস্ত কথা লইয়া কেহ বিচার আলোচনা করেন নাই।

সর্বশাস্ত্র মুকুটমণি বৈষ্ণবগণের আরাধ্য গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতে গোপী কথা আছে। গোপী প্রেমের রহস্য বর্ণিত হইয়াছে। গোপী-গীত, ভ্রমর গীত আছে—সে এক অপূর্ব কাব্য, অপরূপ রসভারের কাব্য, এক অশ্রুতপূর্ব প্রেম কাব্য। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধার স্পষ্ট নাম পাওয়া যায় না। এ দিকে আচার্য শ্রীনিম্বার্ক শ্রীরাধাকে উপাস্যারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি একজন গবেষক নিম্বার্কের কাল নির্ণয় করিয়াছেন। আচার্য নিম্বার্ক শঙ্করাচার্যেরও পূর্ববর্তী। আমার প্রশ্ন শ্রীনিম্বার্কদেব কোথা হইতে শ্রীরাধাকে আবিষ্কার করিলেন। কোন্ শাস্ত্রে তিনি শ্রীরাধার নাম এবং উপাসনার সঙ্কেত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নিম্বার্ক অশাস্ত্রীয় কিছু গ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্রীরাধার উপাসনা তাঁহার স্বকপোল কল্পিত,—এ কথা তো বিশ্বাস করা যায় না। নিম্বার্ক যদি অন্ততঃ দেড় হাজার বৎসর পূর্বে আবির্ভূত হইয়া

থাকেন, তাহা হইলে শ্রীরাধার উপাসনা তাঁহারও পূর্বে প্রচলিত ছিল, ইহা স্বীকার করিতে হয়। পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীব্রজবিদেহী মহারাজ আমাকে বলিয়াছিলেন, শ্রীনারদ শ্রীনিম্বার্কজীকে শ্রীরাধার উপাসনার নির্দেশ দিযাছিলেন। শ্রীশ্রীব্রজবিদেহী মহারাজ কোন পুরাণের বা অপর কোন শাস্ত্রের উল্লেখ করেন নাই।

শ্রীমদ্ভাগবতের রচনাকাল আধুনিক পণ্ডিতগণ খুব পুরানো বলিয়া মনে করেন না। অন্যান্য যে কয়টি পুরাণে শ্রীরাধার নাম আছে সেই পুরাণ কয়খানাও হাল্ আমলের পণ্ডিতগণ অর্বাচীন কালের রচনা বলিয়া মনে করেন। তাহা হইলে নরপতি হাল গাথাসপ্তশতীর মধ্যে রাই কানুকে আনিলেন কোথা হইতে? আচার্য নিম্বার্ক রাধাকে বৃষভানুজা বলিয়াছেন। সপ্তশতীতে যশোদার নাম পাইতেছি। যাঁহারা বলেন লোকগীতির মধ্য হইতেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেমকথা তথা গোপীকথা পরে শাস্ত্রীয় মর্যাদায় উন্নীত হইয়াছে, তাহাদের কথায় শ্রদ্ধা স্থাপন করিতে পারি না। লোকগীতির রাধাও কৃষ্ণকে আচার্য নিম্বার্কের মত একজন সম্প্রদায় প্রবর্তক ভক্ত ও পণ্ডিত উপাসনার পবিত্র পীঠে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ইহা নিতান্তই শিশুসুলভ উক্তি। আচার্য শঙ্করেরও পূর্বে যিনি বেদান্তের ভাষ্য রচনায় স্পর্ধা প্রকাশ করেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ—ভেদাভেদবাদ যাহার প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার প্রতিভার তুলনা খুঁজিতে যাওয়াও বাতুলতা। অধুনালুপ্ত কোন পৌরাণিক সূত্র তাঁহার অবলম্বন ছিল, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পুরাণগুলি প্রাচীন। গুপ্ত সম্রাটগণের সময়ে তাহার সংস্কার সাধিত হইয়াছিল এই মাত্র বলিতে পারি। সে কালে নূতন কোন পুরাণ রচিত হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করিবার মত কোন প্রমাণ নাই। আমার মনে হয় শ্রীমদ্ভাগবতের যে এত মর্যাদা তাহারও কোন গূঢ় কারণ আছে। যদিই বা খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের দিকে—অথবা তাহার কিছু পূর্বে বর্তমান শ্রীমদ্ভাগবতের কোন সংস্কার সাধিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহার কোন পুরানো কাঠামো ছিল, এ কথা অস্বীকার করার কোন অর্থ হয় না। ঐরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ রসভাব-সমৃদ্ধ, অপ্রাকৃত প্রেম সংহিতা একজন যেমন তেমন পণ্ডিতের রচনা বলিয়া আমার মনে হয় না। মনে হয়—কোন বিদ্বান গোষ্ঠীর গোষ্ঠীপতির সাধনালব্ধ এই শাস্ত্র দৈবীপ্রতিভার এক অদৃষ্টপূর্ব নিদর্শন। এবং এই শাস্ত্রই শ্রীপাদ নিম্বার্ককে প্রভাবিত করিয়াছিল। তিনি শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই শ্রীরাধাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নিম্বার্ক স্বকিয়া ভাবের উপাসক।

জয়দেবে পরকীয়াবাদের প্রামাণ্য পরিচয় আছে। আবার স্বকীয়া ভাবেরও সঙ্কেত আছে। এই সম্প্রদায়ের মতে জয়দেবের রাধা কুমারী।

বাঙ্গালায় রাধা পারম্যবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি শ্রীমন্ মহাপ্রভু। ভক্তগণ এই মহাকবিকে রাধাভাব দ্যুতিসুবলিত তনু বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন। গোপী কথার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক শ্রীমহাপ্রভু। রাধা প্রেমেরই বিগ্রহ, রাধা ভাবাঢ্য মূর্তি। প্রেম পৃথিবীতে সেই একবারই লোকলোচনের প্রত্যক্ষীভূতা হইয়াছিলেন—শ্রীরাধারূপে কবি কল্পলোকে শ্রীবৃন্দাবনে। দ্বিতীয়বার বাস্তব জগতের নয়নপথবর্তী হইলেন বাঙ্গালার ব্রজভূমি নবদ্বীপে জঙ্গম হেম কল্পতরু শ্রীগৌরাঙ্গরূপে। এই তত্ত্ব ও তথ্য আজিও ঐতিহাসিক আলোচনার প্রতীক্ষা করিতেছে।

অ-প্রিয়সখা

কুরু রাজধানী হস্তিনাপুরীর উপকণ্ঠ। রাজকুমারগণ খেলিতে খেলিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। খেলিবার সময় তাঁহাদের একটি গুলিকা নিকটবর্তী জলশূন্য কূপে পড়িয়া গেল। নানান চেষ্টায় গুলিকাটি তুলিতে না পারিয়া তাঁহারা পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতেছেন। এমন সময় শ্যামবর্ণ কৃশতনু অগ্নিহোত্রী এক ব্রাহ্মণ রাজকুমারদের জটলা দেখিয়া পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। সমস্ত শুনিয়া তিনি রাজকুমারদিগকে মৃদু তিরস্কারপূর্বক বলিলেন—তোমরা ক্ষত্রিয় সন্তান, রাজকুমার। জলশূন্য এই কূপ হইতে গুলিকাটা তুলিতে পারিতেছ না। তবে আর শিখিয়াছ কি? এই বলিয়া নিজের হাতের আংটিটাও কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। আমার মনে হয় দরিদ্র ব্রাহ্মণের হাতের আংটি—কুশাঙ্গুরীয়ও হইতে পারে। নিতান্তই যদি ধাতব হয়, হয়তো-হয়তো কেন, নিশ্চয়ই সেটা তামারই আংটী ছিল। যাহা হউক ব্রাহ্মণ ঈষিকার সঙ্গে ঈষিকা যুক্ত করিয়া গুলিকাটা উঠাইয়া আনিলেন। রাজকুমারগণ তো দেখিয়া অবাক। একজন বলিলেন এইবার আপনার আংটিটা। আগন্তুক ধনুতে বাণ জুড়িয়া আংটি উঠাইয়া

আসিলেন। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়। রাজকুমারগণ ধরিয়া বসিলেন— মহাত্মন, কে আপনি? ব্রাহ্মণ বলিলেন--তোমাদের পিতামহ ভীষ্মদেবকে আমার এখানে উপস্থিতির কথা বল গিয়া, এই ঘটনার কথাটাও বলিতে ভুলিও না।

রাজকুমারদের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন ভীষ্মদেব, অদ্বিতীয় ধনুর্বিদ্যা বিশারদ আচার্য দ্রোণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। পিতামহ স-সম্ভ্রমে আগমন করিলেন আচার্য সমীপে। এবং যথোচিত সৎকারপূর্বক স্বভবনে লইয়া গিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামান্তে কুশল প্রশ্ন ও আগমনের কারণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

দ্রোণাচার্য বলিলেন মহাত্মন, আমি যখন মহর্ষি অগ্নিবেশের আশ্রমে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিতাম—সেই সময় পাঞ্চাল রাজ পৃষতের পুত্র দ্রুপদ আমার সতীর্থ ছিলেন। একত্র বাস, একসঙ্গে শিক্ষা, একত্রে আহার, ভ্রমণ ও শয়নে দুইজনে অকৃত্রিম সৌহার্দে আবদ্ধ হইলাম। আবেগের আতিশয্যে দ্রুপদ একদিন বলিলেন দ্রোণ, আমি পিতার প্রিয়তম পুত্র। পিতা যখন আমাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবেন—আমি শপথ করিয়া বলিতেছি আমার যাবতীয় ঐশ্বর্য ভোগ এবং সুখ সমস্তই তোমার অধীন হইবে। কিছুদিন পর দ্রুপদ কৃতবিদ্য হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন। আমি স-সম্মানে বিশেষ সম্বর্ধনা সহকারে তাহাকে বিদায় দান করিলাম। অল্পদিন মধ্যে আমার পিতৃদেবও পরলোকে প্রস্থান করিলেন।

আপনি জানেন পিতৃ নির্দেশে আমি কৃপাচার্যের ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছি। যথাকালে একটি পুত্র লাভ করিলাম, নাম অশ্বত্থামা। পিতা আমাকে পাইয়া যেমন আনন্দিত হইয়াছিলেন, আমিও পুত্রলাভে সেইরূপ আনন্দিত হইলাম। ধীরে ধীরে অশ্বত্থামার বয়স বাড়িতে লাগিল। ধনীর দুলালেরা দুগ্ধপান করে দেখিয়া অশ্বত্থামা দুগ্ধপান করিবার বায়না ধরিল। তাঁহার কান্নায় বেদনাতুর হইয়া ধর্মযুগত থাকিয়া একটি দুগ্ধবতী গাভী সংগ্রহের জন্য নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইলাম। কিন্তু গাভী পাওয়া গেল না। হতাশ হইয়া ক্লান্ত বিষণ্ণচিত্তে বাড়ী ফিরিবার পথে দেখিলাম কয়েক জন ধনী সন্তান আতপ চাউল বাটিয়া জল মিশাইয়া সেই পিটুলীগোলা জল দুগ্ধ বলিয়া অশ্বত্থামাকে খাওয়াইয়াছে। আর অশ্বত্থামা দুগ্ধ পান করিলাম বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে। ইহা দেখিয়া সেই নিষ্ঠুর ধনী নন্দনগণ আমাকে ধিক্‌কার দিতেছে। দ্রোণকে ধিক, পুত্রকে দুগ্ধ দিতে পারে না।

যাহার পুত্র পিটুলী গোলা খাইয়া দুধ খাইলাম বলিয়া নাচে, সেই দ্রোণকে শতাধিক!

গাঙ্গেয়, আমি অধীর হইয়া উঠিলাম। ইতিপূর্বে নির্ধন বলিয়া ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক অপাংক্তেয় হইয়াছি, কতদিন উপবাসে দিন কাটাইয়াছি। তথাপি কোন পরসেবারূপ নিন্দিত কর্মে লিপ্ত হই নাই। কিন্তু সেদিন পুত্রের এই দুর্দশা, ধনীর দুলালদের পরিহাস ও তিরস্কার আমাকে প্রায় জ্ঞানশূন্য করিয়া তুলিল। সেই দিনে জীবনের অত্যন্ত সঙ্কটকালে প্রিয়সখা দ্রুপদের কথা মনে পড়িয়া গেল। আমি পত্নী পুত্রসহ পাঞ্চাল যাত্রার উদ্দেশে গৃহত্যাগ করিলাম। পথিমধ্যে শুনিলাম পিতৃবিয়োগের পর দ্রুপদ পাঞ্চাল রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছে। মন অপার আনন্দে পূর্ণ হইল। বন্ধুর সাহচর্য ও তাহার পূর্ব প্রতিশ্রুতির প্রত্যাশায় কৃতার্থন্মন্য হইলাম।

একেবারে দ্রুপদের রাজসিংহাসনের সমীপে গিয়া দাঁড়াইলাম। 'সখা আমি আসিয়াছি, একত্রে ধনুর্বেদ শিক্ষাকালে তুমি যে বলিয়াছিলে আমি যখন রাজ্যভার গ্রহণ করিব, তখন একত্রে দুইজনেই সমান ঐশ্বর্য ও সুখভোগের অধিকারী হইব। সেই কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত দুর্দিনে বিশেষ দুরাবস্থায় পড়িয়াই তোমার নিকট আসিয়াছি।'

কুরুপিতামহ দ্রুপদ আমার কথার কোনরূপ মর্যাদা দিল না। কথায় আস্থা স্থাপনই করিল না। দেখিয়া বিস্মিত হইলাম দ্রুপদ যেন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। দ্রুপদ বলিল—এইরূপে রাজসভা মাঝে আমাকে সখা বলিয়া সম্বোধন করা তোমার উচিত হয় নাই, তুমি ভাল কাজ কর নাই। দ্রোণ, কোথায় হত দরিদ্র এক ভিক্ষুক তুমি, আর কোথায় এক বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর আমি। দেখ বন্ধুত্ব হয় সমানে সমানে। ঐশ্বর্যশালীর সঙ্গে দরিদ্রের বন্ধুত্ব হয় না। বীরের সঙ্গে ক্লীবের, বিদ্বানের সঙ্গে মূর্খের কি কখনো বন্ধুত্ব হয়? কোথায় কখন তোমায় কি বলিয়াছি—আমার স্মরণও নাই। যখন আসিয়াছ—বড় জোর আমি তোমাকে একদিনের ভোজ্য দিতে পারি।

ভীষ্মদেব, অপমানে, অনাহারে আমি পাঞ্চাল হইতে ফিরিয়াছি। কয়েকদিন ধরিয়া গোপনে কৃপাচার্যের গৃহে আসিয়া আছি। অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাইয়াছি—ইহার পূর্বে। কিন্তু কোনদিন পরদাসত্ব করি নাই। আপনার নিকট আত্মসম্মানের কোনরূপ অপহ্নব ঘটিবে না,—সুদৃঢ় প্রত্যয় আছে বলিয়াই আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ সন্ধান করিতেছিলাম। দ্রোণের কথা শুনিয়া ভীষ্মদেব যেমন দুঃখিত হইলেন, তেমনই আনন্দও

অনুভব করিলেন। দুঃখিত হইলেন দ্রুপদের অবিমৃষ্যকারিতায়। বন্ধুজনের, পূজ্যজনের এই অমর্যাদায়। আর আনন্দিত হইলেন আচার্য দ্রোণের মত ভারতবিখ্যাত ধনুর্বিদ্যা বিশারদের শুভাগমনে। এতদিনে দুর্যোধনাদি শত ভ্রাতা এবং যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা কুরুরাজকুমারগণের অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা সুসম্পন্ন হইবে, এই আশায় ও ভরসায় ভীষ্মদেব উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। ভীষ্মদেব বলিলেন আপনার শুভাগমনে রাজপুরী পবিত্র হইল। আমরা কৃতার্থ হইলাম। আমি আপনাকে কুরুরাজকুমারগণের আচার্য পদে বরণ করিতেছি। আপনি অদ্য হইতে এই রাজ্য ও রাজধানী আপনারই অধীন বলিয়া জানিবেন। যখন যে আদেশ করিবেন তাহা তদ্দণ্ডেই প্রতিপালিত হইবে। আমি আপনার উপযুক্ত বাসগৃহের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি। পত্নী পুত্র সহ সেখানে গিয়া বাস করুন। প্রয়োজনীয় ভোজ্য, তৈজস ও অন্যান্য গৃহোপকরণ, কোন কিছুরই অপ্রতুল থাকিবে না। আপনি অনুগ্রহপূর্বক কুরু বালকগণের শিক্ষার ভার গ্রহণ করুন।

ভীষ্মদেবের বিনীত মধুর বাক্যে আহ্লাদিত হইয়া আচার্য দ্রোণ ভীষ্মদেব নির্দেশিত ভবনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কুরুপিতামহ আচার্যের বাস উপযোগী গৃহসহ যাবতীয় গৃহোপকরণ এবং প্রচুর ভোজ্যপরিপূর্ণ ভাণ্ডারাদি তৎপূর্বেই চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাজকুমারগণ একে একে আসিয়া আচার্যের পদ বন্দনা করিলে তিনি তাহাদিগকে অন্তেবাসী বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তাহার পর শিক্ষার্থীগণকে বলিলেন—তোমরা প্রতিজ্ঞা কর শিক্ষা শেষে আমি যাহা চাহিব গুরুদক্ষিণাস্বরূপ তাহাই তোমরা প্রদান করিবে। অপর সকলে মৌন অবলম্বন করিয়া রহিল। কেবলমাত্র অর্জ্জুন বলিলেন গুরুদেব আমি আপনার সমক্ষে শপথ করিতেছি—শিক্ষান্তে আমি আপনার প্রার্থিত গুরুদক্ষিণা প্রদান করিব। ঐদিনই কুরুবংশ ধ্বংসের বীজ উপ্ত হইল। আচার্য দ্রোণ আপনার মৃত্যুপথ পরিষ্কৃত করিলেন।

প্রিয় সখা

সান্দীপনি মুনির পাঠশালাতে কয়েকজন বন্ধু জুটিয়াছিল কৃষ্ণের। মনে হয় বন্ধুভাগ্য তাহার ভালই ছিল। তবে এই সহপাঠীরা সকলেই বেশ লেখাপড়া জানা। গোয়ালা বোধ হয় ছিল না। ইহাদেরই একজন বর্ণশ্রেষ্ঠ সুদামা ব্রাহ্মণ। বিপদ ঘটাইলেন ভদ্র যুবক, লেখাপড়া শিখিয়া বাড়ী ফিরিয়া বিবাহ করিয়া ফেলিলেন। যজন যাজন নাই, ক্রিয়াকাণ্ডে নিমন্ত্রণও পাওয়া যায় না। ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া কি বৌ লইয়া ঘর করা চলে। সুদামার সংসারও প্রায় অচল হইল। সুদামা সরল মানুষ, তিনি জানিতেন না যে, নূতন বৌ-এর নিকট সব কথা বলা যুক্তিযুক্ত নয়। কোন্ অশুভ ক্ষণে পত্নীর নিকট তিনি সহপাঠী কৃষ্ণের কথা গল্প করিয়াছিলেন। বনে কাঠ আনিতে যাওয়ার কথা, ঝড়জলে পথ হারানো, অন্ধকার রাত্রে গাছতলায় কাটানো। কত সুখ-দুঃখের কথা, একেবারে গলায় গলায় ভাবের কথা, কোন কথাই বাকী রাখেন নাই। আর যাবে কোথায়? সেই দিন হইতেই শুরু হইল নানান্ বায়নাক্কা। নব-বধুর উক্তি,—"হ্যাঁ গা—তোমার বন্ধু যে শুনি দ্বারকার রাজা। কত ধন-দৌলত, ছেলেরা না কি মানিকমুক্তো নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। তা, যাও না একবার, গেলেই তো সব দুঃখ ঘুচে যায়। চাইতেও হবে না, গিয়ে একবার দাঁড়ালেই ব্যাস্। অত ভাব নিশ্চয়ই চিন্‌তে পারবে। শুনেছি বন্ধু তোমার খুব লোক ভাল; ব্রাহ্মণ, সজ্জন দেখলে অত্যন্ত খাতির-যত্নও করে।"

সুদামা মুখ সাটোপে বলেন, "যেতে পারবো না কেন? যেতে পারবো না কেন? আমার অত ভয়-ডর নাই। আর চিন্‌তেই বা পারিবে না কেন? তবে কিনা রাজবাড়ী! সাত শত ছাপ্পান্নটা না-কি তার মহল!! আর বন্ধু আমার বিয়েও করেছেন বেশ কিছু সংখ্যায়!!! কোথায় কখন কার মন্দিরে থাকেন সেই হদিশটা পাওয়া শক্ত"। যাই হোক, নবোঢ়া পত্নী যদি দিবারাত্রি এইভাবে কর্ণমূল উত্তপ্ত করেন, সদ্যোবিবাহিত যুবক উত্যক্ত না হইয়া পারেন কি! মরিয়া হইয়া উঠিলেন সুদামা ব্রাহ্মণ, এবং যা থাকে অদৃষ্টে বলিয়া শ্রীহরি স্মরিয়া যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। বধূ বলিলেন, যাইতেছ বন্ধুর নিকট কিছু উপহার লইয়া যাও। এক মুষ্টি গুড় মাখানো তণ্ডুলকণা তিনি দরিদ্রের

উত্তরীয় প্রান্তে বাঁধিয়া দিলেন। মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিলেন, আমার নাম করিয়া তোমার বন্ধুকে দিও। মহিলার মর্যাদা তিনি রাখিতে জানেন।

কত দিন গেল, কত রাত্রি গেল, কত নদী, কত গ্রাম, কত গিরিকান্তার পার হইয়া উপনীত হইলেন দ্বারকার দ্বারপ্রান্তে সুদামা ব্রাহ্মণ। উপবীত গুচ্ছ যাহাতে সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেইভাবে স্কন্ধদেশে লম্বিত রাখিয়াছিলেন। যেন বিন্দুমাত্রও চমকিত হন নাই এই রকম ভাব দেখাইয়া তোরণের পর তোরণ অতিক্রম করিলেন। পাহারা প্রহরীরা সসম্মানে দ্বার ছাড়িয়া দিল। একজন যদুবংশীয় ভদ্রলোক আসিয়া স-সম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্শনে আসিয়াছেন? চলুন আপনাকে লইয়া যাই। তিনি সুধর্মনা সভামণ্ডপে বিরাজ করিতেছেন"। সুদামা শুনিয়াছিলেন সুররাজ সভা সুধর্মনা। শ্রীকৃষ্ণ সে সভা ত্রিদশলয় হইতে দ্বারকায় আনয়ন করিয়াছেন। স্বচক্ষে দেখিলেন সভার মহিমান্বিত সৌন্দর্য। মণি-মাণিক্য-খচিত সভায় রত্ন সিংহাসনে সমাসীন দেখিলেন প্রিয় বন্ধুকে। যেমন সভা, তেমনি সভাপতি। ইহারই নাম বোধ হয় মণিকাঞ্চন সংযোগ। এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে দেখিতে লাগিলেন সভাকে, সভাসদবর্গকে এবং সভার সর্ব শোভাস্পদ সিংহাসনোবিষ্ট দ্বারকানাথকে।

অকস্মাৎ সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন শ্রীকৃষ্ণ। মণিমণ্ডিত সোপানপংক্তি অতিক্রমপূর্বক আসিয়া দাঁড়াইলেন সুদামার পাশে। "সখা, তুমি কতক্ষণ? কই কোন সংবাদ পাঠাও নি তো? তোমার কুশল, বান্ধবী কুশলে আছেন"? হাতে ধরিয়া লইয়া গেলেন—সিংহাসনের সন্নিকটে। দেবেন্দ্র বাঞ্ছিত আসনের অর্ধাসনে বসাইয়া সভাসদগণকে বলিলেন, আমার সখা আসিয়াছেন, পথশ্রমে ক্লান্ত তিনি, আপনাদের অনুমতি হইলে সভা ভঙ্গ করিয়া আমি সখাকে লইয়া গৃহে যাইতে ইচ্ছা করি।

রুক্মিনী, রুক্মিনী, কে এসেছেন দেখ। কত দিন কত রাত্রি যাঁর কথা বলেছি, আমার গুরু-গৃহের সেই সতীর্থ, সেই প্রাণ-প্রতিম সখা সুদামা এসেছেন। এস, এস। প্রধানা মহিষীর মন্দির দ্বারে আসিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন ভগবান পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। আসন কই, পাদ্য কই, অর্ঘ্য কই? রুক্মিনী সসম্ভ্রমে দ্বারপ্রান্ত হইতে সুদামার হস্তাকর্ষণপূর্বক তাঁহাকে আপনার শয়ন প্রকোষ্ঠে লইয়া স্বর্ণাসনে বসাইয়া স্বর্ণ ভৃঙ্গারের সুবাসিত বারিধারায় ব্রাহ্মণের চরণদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া দিলেন। আপনার কেশপাশে মুছাইয়া দিলেন জলসিক্ত চরণ যুগল। হাত ধরিয়া উঠাইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, কই আমার জন্য কি আনিয়াছ বন্ধু?

বান্ধবী কি পাঠাইয়াছেন প্রীতি উপহার। সুদামা সসঙ্কোচে যত লুকাইবার চেষ্টা করেন সর্বান্তর্যামী ততই খুঁজিয়া বাহির করিতে প্রয়াস পান। হাত সাফাইটা ব্রজেই অভ্যস্ত হইয়াছিল। উত্তরীয় প্রান্তের গ্রন্থি খুলিয়া তণ্ডুলকণা বাহির করিলেন কৃষ্ণ, এবং মুখে দিয়া বলিলেন, এ-কি অমৃত নিস্যন্দী স্বাদুতর ভোজ্য, বন্ধু এই বস্তু তুমি লুকাইয়া রাখিয়াছিলে। রুক্মিণী আসিয়া হাত চাপিয়া ধরিলেন। আর না, আর খাইও না প্রভু, ইহাতেই তো তুমি তোমার বন্ধুর কাছে আমাকে চিরদিনের জন্য বিকাইয়া দিলে!

অষ্টাহ অতিবাহিত হইল। এক এক মহিষীর গৃহে এক-এক দিন আমন্ত্রণ। কত আদর, কত যত্ন, কত বিশ্রম্ভালাপ, হাস্যপরিহাস। স্বর্গ সুখ কি এমনই মোদ-মধুর। বাস্তব কি এমনই কল্পলোকের স্বপ্ন সুন্দর। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আর বিলম্ব যুক্তিযুক্ত নয়। বান্ধবী পথ চাহিয়া আছেন। বলিও আমার কথা তাঁহাকে। পারি যদি এক দিন গিয়া দেখা করিয়া আসিব। অশ্রু অবরুদ্ধকণ্ঠ কৃষ্ণ, বাহুবন্ধন মুক্তি করিয়া দিলেন। বিদায় গ্রহণ করিলেন সুদামা। কেন আসিয়াছিলেন সে কথা আর স্মরণ হইল না। প্রার্থনার কথা মনেই পড়িল না। যাহাকে পাইলে সকল পাওয়ার সমাপ্তি ঘটে, সুদামা তাঁহাকেই পাইয়া গেলেন।

বিমলানন্দে ঘরে ফিরিয়া দেখেন কুঁড়েখানির চিহ্নমাত্র নাই। ভাবিলেন হয়তো কোন ধনী সন্তানের প্রমোদ গৃহের দৈর্ঘে-প্রস্থে সমতা হইতেছিল না, তাহারই বিশেষ প্রয়োজনে কুঁড়ে খানির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। চরণে প্রণতা সর্বালঙ্কার ভূষিতা এক প্রমদাকে দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। মহিলা বলিলেন, আমি, আমাকে চিনতে পারছ না? তোমার বন্ধুর লোকজন এসে এই রম্য সৌধ নির্মাণ করে দিয়ে গিয়েছে। এস, দেখবে এস। কত মণি-রত্ন, কত খাদ্যসম্ভার, কত মহার্ঘ্য গৃহ-সজ্জার উপকরণ। তোমার বন্ধুপত্নীর দেওয়া এই বসন-ভূষণ, আরো কত আছে। এস দেখবে এস।

স্থানটির নাম হইয়াছিল সুদামাপুরী। বর্তমানে নাম পোরবন্দর।

বৈষ্ণবী দীক্ষা

আমার মাতামহ বংশের বৃত্তি ছিল পৌরোহিত্য। তাঁহারা গুরুগিরিও করিতেন। যজমান ছিলেন সকলেই ব্রাহ্মণ, শিষ্য ছিলেন একঘর ব্রাহ্মণ এবং কয়েক ঘর সংগোপ। বার্ষিক আদায় করিতে আমিও শিষ্যবাড়ী যাইতাম।

বহুদিন পূর্বের কথা। শিষ্যবাড়ী গিয়াছি। দৈবক্রমে সেদিন তাঁহার পিতার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের তিথি। শিষ্য তো মহা খুশী। পুরোহিতও খুব আনন্দিত হইয়াছেন। শিষ্যটি ছিলেন একেবারে যাহাকে বলে 'বদ্ধ কালা'। অত্যন্ত জোরে না বলিলে কোনো কথা শুনিতে পান না। পুরোহিতকে দেখিলাম ভীষণ 'তোৎলা,। পুরোহিত আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য অতি পরিশ্রমে আধ ঘণ্টা ধরিয়া শিষ্যকে যাহা বুঝাইলেন,—তাহার সারমর্ম—শিষ্যের পরম সৌভাগ্য, স্বয়ং গুরুদেব আজ উপস্থিত। আজ শিষ্যের স্বর্গগত পিতা স্ব-হস্তে পিণ্ড লইয়া স্ব-মুখে সেই পিণ্ড ভোজন করিবেন।

আমি পুরোহিতকে বলিলাম, শ্রাদ্ধমন্ত্র আপনিই পাঠ করুন। যজমানের বলিবার দরকার নাই। পিণ্ড দিবার সময় হাতে তুড়ি দিয়া দেখাইবেন—শিষ্য উদ্দিষ্ট স্থানে পিণ্ড নিক্ষেপ করিবে। ব্যবস্থামতো কাজ চলিতে লাগিল। ইঙ্গিত পাইয়া শিষ্য তিল তুলসী মোটকসহ পিণ্ড হাতে তুলিয়া লইল। পুরোহিত অগ্নিদগ্ধশ্চ যে জীবা' মন্ত্র পাঠের সময় হঠাৎ হাই তুলিয়া হাতে তুড়ি দিলেন। প্রাচীনগণ এখনো কেহ হাঁচিলে বলেন জীব, শতং জীব। এবং নিজে হাই তুলিলে হাতের বৃদ্ধ ও মধ্যমাঙ্গুলির ঘর্ষণে তুড়ি দেন। পুরোহিত প্রথা মতই তুড়ি দিয়াছিলেন। পূর্ব ব্যবস্থা মত ঐ তুড়ি অনুসরণে শিষ্য পিণ্ড লইয়া পুরোহিতের হাঁ করা মুখে ফেলিয়া দিল। মুহূর্তে হুলুস্থুল কাণ্ড ঘটিয়া গেল। আমি না থাকিলে শ্রাদ্ধ 'গোয়াল দুয়ার' পর্যন্ত গড়াইত।

পুরোহিতের প্রশংসায় আমার কিন্তু গুরুগিরির উপর আস্থা বাড়িয়াছিল। আমার উপস্থিতিটা 'অপয়া', তাহারই ফলে পুরোহিতের মুখে অখাদ্য নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, আমি সে কথা বিশ্বাস করিতে পারি নাই। তদবধি শৈব শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বহু গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছি, আলাপ আলোচনা করিয়াছি। কামাখ্যা পাহাড়ে শাক্ত, কাশীধামে শৈব এবং শ্রীধাম বৃন্দাবনে

বৈষ্ণব, তিন সম্প্রদায়েরই গুরুর সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীধাম নবদ্বীপেও এই বিষয়ে আলোচনার সৌভাগ্য হইয়াছে। আমি আজ বৈষ্ণবী দীক্ষার কথাই বলিব।

গুরুবাদ কতদিনের পুরাতন, কোন্ স্মরণাতীত কালে মানুষ দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিল, জানিবার উপায় নেই। শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে একটি শ্লোক আছে—যস্য দেবে পরাভক্তিঃ যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ। পরম দেবে যাঁহার পরাভক্তি, গুরুর প্রতিও যাঁহার তেমনই ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার নিকটেই উপনিষদ কথিত তত্ত্ব প্রকাশিত হল।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—আমাকে আচার্য বলিয়া জানিবে। শ্রীমদ্‌ভগবতে সদ্ গুরুর প্রয়োজনীয়তা, সদ্ গুরুর প্রশংসা পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে (১১।৬।৭৮) নব যোগীন্দ্র সংবাদে যোগীন্দ্র আবির্হোত্র শ্রীনিমিরাজকে বলিতেছেন—লব্ধানুগ্রহ আচার্যত্তেন সন্দর্শিতা গমঃ। মহা পুরুষ মভ্যের্চস্মূর্ত্তাভিমতয়াত্মনঃ। সাধক আচার্য অর্থাৎ গুরুদেবের নিকট মন্ত্র-দীক্ষা-রূপে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া সেই আচার্যোপদিষ্ট আগম অর্থাৎ মন্ত্রশাস্ত্র সম্মত নিজের অভিমত বিগ্রহের মাধ্যমে মহাপুরুষ শ্রীভগবানের অর্চনা করিবেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের সাবিত্রী দীক্ষা,—গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষাই প্রথম দীক্ষা—এই দীক্ষা দ্বিতীয় জন্মরূপে উল্লিখিত হয়। তেমনই গুরু প্রদত্ত মন্ত্র দীক্ষা যে দ্বিজত্ব লাভের অন্যতম সোপান, ইহাও শাস্ত্রবাক্য।

বৈষ্ণবগণের প্রামাণ্য স্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিতেছেন—(১ম বিলাস ৪০ শ্লোক) মহাকুল প্রসূতোহপি সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ। সহস্র শাখাধ্যায়ীচ ন গুরুসাদবৈষ্ণবঃ।। ব্রাহ্মণোপি সৎকুল ধর্মাধ্যায়নাদিনা প্রখ্যাতোপি অবৈষ্ণব শ্চেত্তর্হি গুরুর্ন ভবতীতি সর্বাপবাদং লিখতি।।

নারদ পঞ্চরাত্র বলিতেছেন—অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ংব্রজেৎ। পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েৎ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ।।

অবৈষ্ণবের মন্ত্র গ্রহণ করিলে নরকে বাস করিতে হয়। সুতরাং পুনরায় সম্যক বিধিসম্মতরূপে বৈষ্ণব গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করা কর্তব্য।

গোদাবরীতীরে শ্রীল রায় রামানন্দের নিকট শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত) কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী (শূদ্র কেনে নয়) যেই কৃষ্ণ তত্ত্ব বেত্তা সেই গুরু হয়। মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে আমরা দেখিতেছি—শ্রীখণ্ডের

বৈদ্যশ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর, শ্রীরঘুনন্দন এবং রঘুনন্দনের বংশধরগণ বহু ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দান করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আলোক উজ্জ্বল আজিকের দিনেও এই প্রথা অব্যাহত আছে।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। সেকালে বহু শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বহু সৎ বংশজ কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ পূর্বক তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ ছিলেন জাতিতে সৎগোপ। বহু ব্রাহ্মণ তাঁহার পাদ বন্দনায় কৃতার্থ হইতেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বন্দ্যনীয় আচার্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ শ্যামানন্দ পরিবারেই দীক্ষা গ্রহণে ধন্য হইয়াছিলেন। • এমন কত উদাহরণ দেব।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু প্রবর্তিত ধর্মে আস্তিকবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মেরুদণ্ডরূপে গৃহীত হইয়াছিল চরিত্র। এই ধর্মে অকপট নিষ্কলুষ চরিত্র বিচারেই মনুষ্যত্বের পরিমাপ নির্ণীত হইত। ভগবদ্ ভক্তি ছিল এই মনুষ্যত্বের অলঙ্কার। তাই খোঁলা বেচা শ্রীধর, ভিক্ষুক শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বৈষ্ণবোত্তমরূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন। ভুঁইমালী ঝড়ুঠাকুরের উচ্ছিষ্ট ভোজনে জন্ম সার্থক জ্ঞান করিয়াছিলেন। অভিজাতবংশীয় সপ্তগ্রামের ধনকুবের গোবর্দ্ধন দাসের জ্ঞাতিভ্রাতা কালিদাস। বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট ভোজনের সুফল হাতে হাতে পাইয়াছিলেন কালিদাস শ্রীধাম পুরুষোত্তমে। ইহজীবনেই এই পুণ্য ফলপ্রদ হইয়াছিল কালিদাসের। তিনি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পাদধৌত বারি অঞ্জলি ভরিয়া বার বার তিনবার পান করিয়া দেববাঞ্ছিত সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। বিষ্ণুভক্ত জ্ঞান যে ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ সেদিন এই বাণী শাস্ত্রীয় মর্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

এই সেদিন তো দেখিলাম,—ধুরন্ধর নৈয়ায়িক এবং প্রবল প্রতাপ স্মার্তগণ অধ্যুষিত শ্রীধাম নবদ্বীপের বুকের উপর নামসিদ্ধ শ্রীরামদাস বাবাজী মহারাজ ব্রাহ্মণ সন্তানকে দীক্ষা দান করিতেছেন। পূর্বাশ্রমে তিনি বৈদ্যবংশীয় রূপে পরিচিত ছিলেন। এই বৈষ্ণবাগ্রগণ আচার্য সন্তানগণকে দেখিলেই ভূলুণ্ঠিত হইতেন। আশ্রমে—নবদ্বীপে, কি বরানগরে, অথবা পুরীধামে গোস্বামী সন্তান কেহ উপস্থিত থাকিলে অগ্রে তাঁহাকে ভোজন করাইয়া পরে তিনি ভোজন করিতেন। এই বিনয়ান্বিত সম্ভ্রম, এবং তাহার মধুর চরিত্র তাঁহাকে আচার্য পদবীতে উন্নীত করিয়াছিল। অবশ্য সেই সঙ্গে ছিল সাধন মার্গের উন্নত সোপানে আরোহণের নিশ্চিত চিহ্ন তাঁহার আচরণে, তাঁহার ভাষণে এবং এমন কি সর্বদেহে সুপ্রকাশিত।

হুজুগে অনেক কিছু হয়। হয়; কিন্তু দুদিনেই তাঁহার স্বরূপ প্রকাশিত

হইয়া পড়ে। জনসাধারণের সতর্ক দৃষ্টি তাহার আসল রূপ উদ্‌ঘাটিত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। সুতরাং যিনি মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন, মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হইয়াছেন, চরিত্র যাঁহার নিষ্কলঙ্ক, ব্যবহার যাঁহার মধুর, উপদেশ যাঁহার আচরণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তিনিই আচার্যের আসনে উপবিষ্ট হইবার যোগ্য ব্যক্তি। এ হেন ব্যক্তির জাতি কুল অনুসন্ধানের কোন অর্থ হয় না। আমাদের দুর্বলতা আমরা কাহারো প্রতিষ্ঠা দেখিলে তাহার ছিদ্রান্বেষণে তৎপর হই। অযথা কুৎসা রটনা পূর্বক তাহার চরিত্রে কলঙ্ক লেপনে সত্য-মিথ্যার অনুসন্ধান করি না। কাহারো অঙ্গে কলঙ্কের কর্দম নিক্ষেপ করিতে হইলে যে সর্বাগ্রে নিজের হস্ত কর্দমাক্ত হইয়া উঠে। আমরা এ কথা বিবেচনার অবসর পাই না।

বঙ্গেশ্বর হরিবর্ম দেবের সন্ধিবিগ্রহিক রাঢ়ের দেবগ্রাম প্রতিবদ্ধ বালবলভি ভুজঙ্গ ভবদেব ভট্ট—সর্বধর্মচ্যুত বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত অধঃপতিত কতকগুলি হিন্দুকে পুরোহিত দান পূর্বক শুদ্ধি সাধনে হিন্দু সমাজে জলচল্‌ করিয়া লইয়াছিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর অনুবর্তী-আচার্যগণ শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ এবং বীরচন্দ্র প্রভু হিন্দু সমাজের তথাকথিত বহু নিম্নশ্রেণীর হিন্দুকে দীক্ষাদান পূর্বক তাহাদিগকে একতাসূত্রে বাঁধিয়াছিলেন। তাঁহাদের মনুষ্যত্ব জাগরণের সহায় হইয়াছিলেন। তাহাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলেন। শৌচ সদাচার পালনে প্রবৃত্তি দিয়াছিলেন। এই সমস্ত সম্প্রদায় যে বিশাল হিন্দু সমাজেরই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, উন্নত সমাজসৌধের সুদৃঢ় ভিত্তিস্বরূপ, এই বোধ তাহাদের অন্তরে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন।

বর্তমান দুর্দিনে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ পূর্ববর্তী আচার্যগণের পন্থানুসরণকারী একজন যুগন্ধর পুরুষ। এই শক্তিমান আচার্যের দিব্যাবদান হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিয়াছে। সমাজের অন্তরে শৌচ, সদাচার স্বধর্মে নিষ্ঠা, ভগবদ্ভক্তির প্রেরণা এবং সাধনে বিশ্বাস আনয়ন করিয়াছেন। আমার স্বর্গগত সুহৃদ সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী বার বার আমার নিকট প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণের কার্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন বিজয়কৃষ্ণের বিবেকানন্দ ছিল না। থাকিলে তিনি গঠনমূলক কাজে আরো অগ্রবর্তী হইতে পারিতেন। বোধহয় গিরিজাশঙ্করের কোন পুস্তকেও এইরূপ উক্তি আছে। ভাবিয়া আশ্চর্যান্বিত হই যে—ডন্‌ সোসাইটির সতীশ মুখোপাধ্যায়, বিপিন পাল প্রভৃতি নবযুগের চিন্তানায়কগণ প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণের প্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত। ভগবৎ প্রেম ও মানবপ্রেম—তথা দেশপ্রেম, তাঁহার নিকট কোন

পৃথক পদার্থ ছিল না। বিজয়কৃষ্ণের এক শূদ্র শিষ্য তাঁহারই অনুমোদনে সমাজের সকল সম্প্রদায়কেই দীক্ষাদান করিয়াছিলেন। এই দুর্দিনে সংঘবদ্ধ বৈষ্ণব সমাজের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। দ্বিধা নাই, দ্বন্দ্ব নাই, ক্লৈব্য নাই, দৌর্বল্য নাই—ভগবদ্‌প্রেম তথা মানব প্রেমে অকুতোভয় বীর্যশালী বিনীত বৈষ্ণব সমাজ। সমাজ হইতে উচ্ছৃঙ্খলতা—স্বার্থ লোলুপতা, দুর্নীতির প্রমত্ততা এবং ক্ষমতার মাদকতা দূর করিতে হইবে। সমাজের মধ্যে একতা বোধ জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে। সমাজে শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে হইবে। রাজনীতিকে অন্তরালে রাখিয়া সমাজের শ্যাম সমতলের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করিতে হইবে। ঈর্ষা ও হিংসার বিষদংশ ও মৎসরতার কবল হইতে আত্মরক্ষার দ্বিতীয় কোন পথ আছে কিনা আমি জানি না। আমি মনে করি বৈষ্ণবী দীক্ষাই আমাদের সর্বাভীষ্ট পূর্ণ করিবে।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা
কীদৃশো বা নয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত মধুরিমা
কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ
কীদৃশং বেত্তি লোভাৎ
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি
শচী গর্ভ সিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

এই শ্লোকে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অত্যন্ত মর্মরসের সাগর, সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ—শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবের কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। অবতার গ্রহণের প্রধান কারণ—অথবা একমাত্র কারণ।

কবিরাজ গোস্বামী কৃষ্ণদাস স্ব-প্রণীত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিতেছেন—

এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ়
কহিতে না জুয়ায়।

না কহিলে কেহ
ইহার অন্ত নাহি পায় ॥
অতএব কহি কিছু
করিয়া নিগূঢ় ।
বুঝিবে রসিকজন
না বুঝিবে মূঢ় ॥

অপর কোন শ্লোক ব্যাখ্যায় তিনি এতটা সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। পূর্ব কৈফিয়ৎ দিয়া এমন নিগূঢ় ব্যাখ্যাও করেন নাই। অবশ্য শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অর্থ সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। ভক্তগণের কৃপা না হইলে সে অর্থ বুঝিতে পারা যায় না। এ হেন শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতরূপ অক্ষয় সরোবরের মূল উৎস হইল এই শীর্ষোধৃত শ্লোক।

কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—যাহার হৃদয়ে শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, সেই সজ্জনই এইসব সিদ্ধান্তে আনন্দ লাভ করিবে। এইসব সিদ্ধান্ত রস আম্রের পল্লব স্বরূপ, এবং ইহা ভক্ত কোকিলগণের সদাকালের বল্লভ। অভক্ত উষ্ট্র যদি ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে তবে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইব। এইরূপ ভূমিকা করিয়া কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার, নিঃশঙ্কে কহিয়ে তার হউক চমৎকার।

ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্ন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্তরে বিচার করিতেছেন—শ্রুতিগণ এবং ঋষিগণ আমাকে পূর্ণানন্দ পূর্ণ রসরূপ বলিয়া অভিহিত করেন। আমা হইতেই ত্রিভুবন আনন্দিত হয় অতএব আমাকে আনন্দিত করিবে—আনন্দদান করিবে কে? আমা অপেক্ষা যে জন শত শত গুণে আনন্দ লাভ করে, একমাত্র সেইজনই আমাকে আহ্লাদিত করিতে পারে। যদিও আমি অসমোর্ধ্বরূপ গুণের অধিকারী, ত্রিলোকে আমার সমান অথবা অধিক রূপগুন-যুক্ত কেহ নাই, তথাপি শ্রীরাধাকেই ইহার ব্যতিক্রম বলিয়া অনুভব করিতেছি। কোটিকাম বিজয়ী আমার রূপ, ত্রিলোকে আমার মাধুর্যের সাম্য নাই, কিন্তু শ্রীরাধা?

আমার রূপে ত্রিভুবন আপ্যায়িত হয়, কিন্তু শ্রীরাধাকে দেখিলে তাহার রূপে আমার নয়ন পরিতৃপ্তি লাভ করে। আমার বংশীগানে ত্রিভুবন আকৃষ্ট হয়। কিন্তু শ্রীরাধার বচনে আমার শ্রবণ বিবশ হইয়া আসে। যদিও আমার অঙ্গগন্ধই জগতের সমস্ত সুগন্ধের আকর, তথাপি রাধার অঙ্গগন্ধে আমার মন এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় প্রমত্ত হইয়া উঠে। আমার স্পর্শ কোটীন্দুশীতল, কিন্তু রাধার

স্পর্শ আমাকে সুশীতল করে। আমিই জগতের সুখ হেতু, কিন্তু শ্রীরাধার রূপ গুণই আমার জীবনোপায়।

এই অনুভবই আমার প্রত্যয়সিদ্ধ, কার্যকালে কিন্তু ইহার বিপরীত দিকটাই দেখিতে পাই। রাধার দর্শনে আমার নয়ন জুড়ায়, কিন্তু আমাকে দেখিলে রাধা অসহ সুখে অজ্ঞান হয়। বেণুকুঞ্জের পরস্পর ঘর্ষণে যে মর্মরধ্বনি উদ্গত হয়, রাধা তাহা শুনিয়াই আমার বংশীধ্বনি ভ্রমে চেতনা হারায়। বর্ণসাদৃশ্যে তমালবৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়াই, কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়াছি, মনে করিয়া জন্ম সার্থক জ্ঞান করে। আমার অঙ্গ-গন্ধ প্রেমান্ধ রাধিকাকে উন্মাদিনী করিয়া তোলে। আমার চর্বিত তাম্বূল আস্বাদনে সে আনন্দ সমুদ্রে মগ্ন হয়। আমার সহিত মিলনে রাধা যে আনন্দ লাভ করে আমি শত মুখ পাইলেও তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। লীলাঅন্তে তাহার অঙ্গসৌন্দর্য দর্শনে আমি আত্মবিস্মৃত হই।

এই সমস্ত বিচার করিয়া মনে হয় আমার মধ্যে এমন এক রস আছে, আমার মনমোহিনী রাধা যাহাকে বশ করে। রাধা আমা হইতে যে জাতীয় সুখ পায়, সেই সুখ আস্বাদন জন্য সদাই উন্মুখ হইয়া থাকি। কিন্তু বহু যত্ন করিয়াও তাহা আস্বাদন করিতে পারি না। এইজন্যই আমার অবতার গ্রহণ। রাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার করিয়াই আমি অবতীর্ণ হইয়াছি।

উদ্ধৃত শ্লোকের সংক্ষেপ অর্থ—শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা কিরূপ, শ্রীরাধা আমার যে মাধুর্য আস্বাদন করেন, তাহা কেমন এবং শ্রীরাধা আমার মাধুর্য আস্বাদন করিয়া যে আনন্দ পান তাহা কেমন? এই লোভেই শ্রীশচীনন্দন অবতীর্ণ হইয়াছেন।

লক্ষ্য করিবার বিষয়, শ্লোকে শ্রীরাধার প্রণয় মহিমার কথাই আছে, মাধুর্যের উল্লেখ নাই। কিন্তু নিজের বেলায় সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে— "স্বাদ্যোযেনাদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ব্রজে রাধামাধুর্য শ্রীকৃষ্ণ আস্বাদন করিয়াছিলেন। কিন্তু মহিমার উপলব্ধি হয় নাই। শ্রীচৈতন্য অবতারে শ্রীরাধার প্রণয় মহিমাই প্রথম কথা। এই মহিমাই তাঁহাকে অচণ্ডালে প্রেম দানে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। এই মহিমার বশেই তিনি ভুবন মঙ্গল হরিনাম বিতরণ করিয়াছেন।

নাম সঙ্কীর্তনকে যুগধর্ম প্রবর্তন বলিলে সব কথা বলা হয় না। এই যুগধর্ম প্রবর্তনের মধ্যেই তাঁহার ঋণ পরিশোধের প্রয়াস আছে। যদিও এই ঋণ অপরিশোধ্য। কারণ শ্রীবৃন্দাবনে তিনি বলিয়াই দিয়াছেন, দেব পরমায়ু

পাইলেও অর্থাৎ অমর হইলেও এ ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না। তোমাদের স্ব-সাধুকৃত্যেই ইহা সার্থকতা লাভ করিয়াছে। অমরতার অর্থ—এখানে লীলার প্রকট কাল তো সীমাবদ্ধ। সুতরাং ঋণী হইয়াই রইলাম।

যুগধর্ম প্রবর্তনের মধ্যেই তাঁহার তিনটি বাঞ্ছা পূর্তিরও প্রচেষ্টা আছে। নামসঙ্কীর্তনেই সর্বানর্থ নাশ হয়, মানব সর্বাভীষ্ট লাভ করে। রাধা প্রণয়ের মাধুর্য তো আছেই, রাধার প্রণয় মহিমাই শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে নরনয়নের গোচরীভূত করিয়াছে। আমাদিগকেও এই রাধা প্রণয়ের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে হইবে। সর্বস্বার্থ বিসর্জন দিয়া শ্রীভগবানকে ভালবাসিতে শিখিতে হইবে। যে মানুষকে ঘৃণা করে, সে কখনো ভগবানকে ভালবাসিতে পারে না। ভগবদ্‌প্রেম ও মানব প্রেমের সেতুবন্ধ শ্রীগৌরাঙ্গদেব। দেশকে ভালবাস, জাতিকে ভালবাস—সর্বত্যাগ করিয়া ভালবাসিতে হইবে। কোন কপটতা নয়, কোন ছলনা নয়, কোন স্বার্থসিদ্ধি নয়—নিঃস্বার্থ ভালবাসা। আজিকার এই দুর্দিনে ইহার সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন। এই পৌর্ণমাসী রজনীতে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবকে স্মরণ কর। এই পুণ্য তিথিকে সার্থক কর। শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা তোমাকে সর্বসিদ্ধি দান করিবে।

মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম

শ্রীমহাপ্রভুর প্রবর্তিত প্রেমধর্ম কেন বাঙ্গালী গ্রহণ করিয়াছিল, তাঁহার দিব্যাবির্ভাবের পুণ্যতিথিতে আমি এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করিতেছি। ভীরু অপবাদ বাঙ্গালীর শত্রুপক্ষের রটনা। বাঙ্গালী কোন কালেই ভীরু ছিল না। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে যে বাঙ্গালী বাঁকুড়া জেলার পুষ্করণা বা পখরণার অধিপতি ছিলেন, দিগ্বিজয়ী সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের নিকট তিনি নতিস্বীকার করেন নাই, সম্মুখযুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে তাঁহার শিলালেখ আছে। পখরণার রাজা চন্দ্রবর্মা চক্রস্বামী বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। কর্ণসুবর্ণের পরক্রান্ত নরনাথ শশাঙ্ক-থানীশ্বরের হর্ষবর্ধন ও আসমের ভাস্কর বর্মণ—দুই দিক হইতে উভয় কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াও যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার নাই। সঞ্চিত মণিরত্ন ও সৈন্য-সামন্ত লইয়া তিনি ময়ূরভঞ্জের আরণ্যভূমে বেণুসাগর খিচিংএ গমন করেন। সেখানে রাজধানী স্থাপন পূর্বক শশাঙ্ক স্বীয়

স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার এক সেনাপতির নাম মাধব বর্মা। ইহার উপাধি ছিল 'শৈলভিদ'—পর্বত-ভেদকারী। যে শিল্পী শিলালিপি উৎকীর্ণ করিয়াছিল, তাহার প্রমাদে মাধব বর্মা ঐতিহাসিকগণের নিকট "সৈন্য ভীরু" উপনামে পরিচিত হইয়াছিলেন। বিজয়নাগ দেব খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের স্বাধীন গৌড়েশ্বর। পাল সম্রাটগণ বাঙ্গালী ছিলেন, তাঁহাদের শৌর্যবীর্যের পাথুরে প্রমাণ আছে। রামপাল কৈবর্ত বিদ্রোহ দমনের জন্য যুদ্ধে যাহাদের সাহায্য লইয়াছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই বাঙ্গালী। দক্ষিণ রাঢ়ের শূর নরপতিগণ, বঙ্গের যাদব রাজগণ, রাঢ়ের অধীশ্বর সেন রাজগণ, সকলেই বাঙ্গলাকে স্বদেশ বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গের এক রাজার তাম্র শাসনে লেখা আছে গোপীনাথ কেলিকার কৃষ্ণই মহাভারতের সূত্রধার। এই সিদ্ধান্ত হাজার বৎসর পূর্বেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল। সেন রাজারাও বাংলায় আসিয়া বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের সৈন্য-সামন্ত, সেনাপতি, মন্ত্রীরাও বাঙ্গালী ছিলেন। সতেরজন ঘোড়সওয়ার বাংলা জয় করিয়াছিল, এ-কথা যাহারা বলে, তাহারা নির্লজ্জ, নির্জলা মিথ্যা কথাই বলে। কতকগুলি কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতকের ষড়যন্ত্রে লক্ষ্মণ সেন রাঢ় গৌড় ত্যাগে বাধ্য হইয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গে গিয়া তিনি নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। যুবরাজ কেশব সেনেরও সেখানে কিছুদিন স্বাধীন ভাবেই রাজ্য পরিচালনায় অতিবাহিত হয়। এইতো সেদিনও আপন বাহুবলে বাঙ্গালী দনুজমর্দনদেব বিদেশী শাসনকর্তার হাত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয়াছিলেন। গৌড় সিংহাসন তাঁহার চরণস্পর্শে ধন্য হইয়াছিল। সুতরাং মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম গ্রহণ বাঙ্গালীর পরাজিত মনোবৃত্তির পরিচায়ক নহে।

যে প্রেমে ক্লৈব্যের অপহ্নব ঘটে, দুর্বলতা দূরীভূত হয়, যে প্রেম কাপুরুষতাকে করে তিরস্কার, মহাপ্রভু সেই পৌরুষে প্রোজ্জ্বল মরণজয়ী প্রেমেরই সাকার ও সাবয়ব বিগ্রহ। মহাপ্রভু সেই অভয় মন্ত্রের উদ্‌গাতা, যে অভিঃ অভীষ্টকে করায়ত্তে আনিয়া দেয়। দুরারোহ পর্বতমালা, অপার পারাবার, দুষ্প্রবেশ্য মরু প্রান্তর, পথ চিহ্নহীন ভয়াবহ অরণ্যভূমি যে প্রেমের গতিরোধ করিতে পারে না, যে প্রেম কালস্রোতে অবলুপ্ত হয় না, মহাপ্রভু সেই প্রেমেরই ধারক এবং বাহক। মহাপ্রভু সুদূর ভবিষ্যোত্তর যুগের অগ্রবর্তী মানব। একদিন ইউরোপ, আফ্রিকা আমেরিকা, এশিয়া, চীন-সমগ্র পৃথিবীর নর-নারীকে যে ধর্ম গ্রহণ করিতে হইবে, মানব জাতির প্রতিভূরূপে বাঙ্গালী সেই ধর্মই গ্রহণ করিয়াছিল। যে প্রেম সাবধানী প্রবীণদের পা গণিয়া চলার অহেতুক মুরুব্বিয়ানাকে মানে না, তথাকথিত হিতৈষীর হিতোপদেশ গ্রাহ্য করে না, স্বজনের অশ্রুপ্লাবিত আর্তরোল

যে প্রেমের পথ রোধ করিতে পারে না, প্রতিবেশীর বিদ্রুপবাণে যে প্রেম সঙ্কল্পচ্যুত হয় না, গৃহের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া পথে বাহির হইয়া যে প্রেম সার্থক হয়, বাঙ্গালী সেই প্রেম প্রচারের ব্রতই গ্রহণ করিয়াছে। প্রচারের উত্তরাধিকার অর্জন করিয়াছে। ব্যক্তিকে ভালবাস, জাতিকে ভালবাস, দেশকে ভালবাস, এই প্রেমের প্রেমিক না হইলে সে ভালবাসা সার্থকতায় সফল হইবে না।

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী বাঙ্গালী। তিনিই বাঙ্গালীকে পরাধীনতা মুক্তির নূতন দিগন্ত পথযাত্রার মন্ত্র শুনাইয়াছিলেন। এই মন্ত্রের সিদ্ধ সাধক আচার্য অদ্বৈত। তিনি বুঝিয়াছিলেন এই অভয় মন্ত্রেই মানবজাতির উদ্ধারের রহস্য লুকাইয়া আছে। অতি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী রচনা করিয়া কয়েকজন অন্তরঙ্গ মনের মানুষ লইয়া তিনি এই মন্ত্রের সাধনা করিয়াছিলেন। এই সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষের সাধনা নিষ্ফল হয় নাই। এই মন্ত্রের মূর্ত বিগ্রহরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বাঙ্গালীর প্রাণপুরুষ শ্রীগৌরাঙ্গ দেব, নদীয়ার নিমাই পণ্ডিত, ভারতের শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, পৃথিবীর পরিত্রাতা মহাপ্রভু।

এই মন্ত্রের গূঢ়ার্থ হইল শ্রীভগবান আছেন। তিনিই সত্য। মানবদেহ তাঁহারই বিহারক্ষেত্র। মন্দিরে থাকেন প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ, আর মানবদেহে, যাবজ্জীবন তিনি স্বয়ং অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। প্রতি নরনারীর মধ্যে শ্রীহরির অধিষ্ঠান জানিয়া সম্মান দিতে হইবে, তাঁহাকে ভালবাসিতে হইবে। আপনার করিয়া লইতে হইবে। স্থাবর জঙ্গমে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে জানিলে ও পারিলে স্বার্থ লইয়া আর বিরোধ ঘটিবে না। শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব, সে-কি হিংস্র শ্বাপদের মত নখ-দন্ত লইয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া আত্মহত্যার অন্ধকূপে অবলুপ্ত হইবে? পরস্পরকে শাসন করিয়া শোষণ করিয়া চরিতার্থ হইবে? আজ এই প্রশ্ন বিচারের দিন আসিয়াছে। এই প্রশ্নের সুষ্ঠু সমাধানের উপর সমগ্র পৃথিবীর নরনারীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।

একটিমাত্র মুষল ছত্রিশ কোটি যদুবংশকে ধ্বংস করিয়াছিল।

ঐশ্বর্য মদান্ধ অহংদর্পে আত্মহারা মানব প্রতি রাজ্যে সাধ করিয়া যাচিয়া সেই মুষল সৃষ্টি করিতেছে। সে সৃষ্টি করিতে পারিতেছে না, সে কাঁদিয়া কাটিয়া অস্থির হইতেছে, হতাশায় হাহাকার তুলিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে। আর যাহারা সৃষ্টিকার্যে সাফল্যলাভ করিতেছে, তাহারা যাহাকে তাহাকে শাসনের জন্য হুঙ্কার ছাড়িয়া পৃথিবী কাঁপাইতেছে। এমন কি কেহ নাই যে, এই আস্ফালনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে পারে, এবং ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষের রোষবহ্নিতে আত্মদান করিতে অগ্রসর হইয়া আসে।

মহাপ্রভু চরিত্রকেই মনুষ্যত্বের মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন; চরিত্রহীন মানুষ পশুর সমান। মহাপ্রভু ধর্মকেই মানবতার নিবাসস্থল বলিয়াই জানিতেন। ধর্মহীন মানব মৃত, প্রেত তুল্য। অর্থ মান খ্যাতি প্রতিপত্তি সমস্তই নিরর্থক —যদি মানুষের চরিত্র না থাকে, যদি মানুষ ধর্মহীন হয়।

মালা তিলক করিতে হইবে না। নীতিমান হও, ধার্মিক হও মনে-প্রাণে অকপট হও, প্রেমিক হও, মানুষ তুমি, মানুষকে—তথা সারা পৃথিবীর স্থাবর জঙ্গমকে ভালবাসিয়া কৃতার্থ হও। শ্রীভগবানকে ভালবাসিতে পারিলেই তুমি মানুষকে তথা সৃষ্ট জীবকে ভালবাসিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে। শ্রীভগবানকে যে ভালবাসা যায়, তাঁহাকে যে সম্বন্ধের বন্ধনে আবদ্ধ করা যায়, ইতিহাসে তো তাহার উদাহরণ আছে। ভালবাসার যে একটা ঐতিহ্য আছে, তুমি কি শোন নাই, জান না? শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার জঙ্গম প্রতিমারূপে কতকগুলি বনচরী কিশোরী শ্রীধাম বৃন্দাবনে আবির্ভূতা হইয়া জীবনে আচরণপূর্বক সর্বধর্ম ত্যাগের —তথা সর্বস্ব বিসর্জনের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। পুরাণেতিহাসে সে কথার বর্ণনা আছে। শ্রীভগবান প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে আমাকে যেভাবে পাইতে চাহিবে, আমি তাহাকে সেইভাবেই ভজনা করিব। কিন্তু ঐ আভীর বধূগণের নিকট তাহার সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইয়াছিল। দর্পহারী কাহারো দর্প সহ্য করিতে পারেন না। নিজের দর্পও সহ্য করেন না। কারণ প্রকৃত মানুষ তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলে, একথা তিনি জানেন। তাই নিজের প্রতিজ্ঞাও নিজেই ভাঙ্গিয়াছিলেন। বহু ক্ষেত্রে ভাঙ্গিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই বহু ক্ষেত্রের মধ্যে শ্রীধাম বৃন্দাবনের স্থান সবার উপরে। ব্রজবাসিগণের ভালবাসার প্রতিদান তিনি দিতে পারেন নাই। ব্রজবধূগনের নিকট সুস্পষ্ট ভাষায় মুক্ত কণ্ঠে এই ঋণ তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন।

বাঙ্গলার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য এই ঋণভার মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। মানুষকে মনুষ্যত্বের সাধনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া ব্রজপ্রেমে প্রেমিক হইবার আবাহন জানাইয়া দ্বারে দ্বারে ভিখারীর বেশে ফিরিয়া তিনি এই ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই ঋণ কিন্তু পরিশোধিত হয় নাই। তিনি সমগ্র বাঙ্গালী জাতির উপর এই দায় ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। এই পুণ্যদিনে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথিতে আমি বাঙ্গালার নরনারীকে সেই কথা আর একবার স্মরণ করাইয়া দিতেছি।

স্মরণ করাইয়া দিতেছি—মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম বাঙ্গালীকে বলহীন করিয়াছিল, তাহারা কি বার বার বাঙ্গালীর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার কথা ভুলিয়াছে? বার

স্তূপাকার অভ্যুত্থানের কথা তো মিথ্যা নহে। কিন্তু রাজ্য জয়ে কিছু হইবে না। হৃদয় জয় করিতে হইবে। তাই মহাপ্রভু রাজনীতিকে অন্তরালে রাখিয়া তাহারই সমান্তরালে দাঁড়াইয়া বাঙ্গালীকে সমাজ গঠনে তৎপর করিয়াছিলেন। নামপ্রেম গ্রহণে প্ররোচিত করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভুর গৃহত্যাগে সারা বাঙ্গলায় হাহাকার উঠিল। পদমর্যাদার উচ্চ-শিখর হইতে পথের ধূলায় নামিয়া আসিলেন রূপ-সনাতন। সপ্তগ্রামের ধনকুবেরের সন্তান রঘুনাথ দাস তাহাতে পূর্ণাহুতি দিলেন। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌম যুবক সন্ন্যাসী শ্রীগৌরাঙ্গের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইয়া দেখাইলেন যে বিদ্যার অহঙ্কারও সেখানে নতমস্তক। রূপ-সনাতনের ক্ষমতার গর্ব, রঘুনাথের ঐশ্বর্যের মাদকতা, সার্বভৌমের বিদ্যার দম্ভ সমস্ত ঐ ভাব মন্দাকিনী ধারায় আসিয়া মিশিয়া গেল। প্রেমধর্মের প্রবর্তক বাঙ্গালী প্রচারক বাঙ্গালী, ধারক ও বাহক বাঙ্গালী। বাঙ্গালী আজ আর একবার অগ্রসর হইয়া আইস। সারা পৃথিবী তোমার পথ চাহিয়া আছে।

বচন ও আচরণ

শ্রীশ্রীরামলীলা শ্রবণ করিলেন মরণোন্মুখ ভারত সম্রাট পরীক্ষিত। শ্রবণ করিলেন গঙ্গাতীরবর্তী সভাস্থ সমাগত মুনি ঋষিগণ, কৃষ্ণভক্তগণ, সামন্ত রাজন্য-মণ্ডলী এবং জনসাধারণ। জনসাধারণের মধ্যে আস্তিক নাস্তিক সর্ব শ্রেণীরই লোক ছিলেন। যে লীলা শ্রবণে হৃদয় অনাময় হয়, হৃদয়ের কাম-কামনা প্রশমিত হয়, কৃষ্ণানুগৃহীত মানস বিষ্ণুরত অভিমন্যু তনয় সর্বমানবের সংশয় ছেদন জন্যই প্রশ্ন করিলেন—ধর্ম সংস্থাপনার্থ, অধর্ম বিনাশ নিমিত্ত যাহার আবির্ভাব, ধর্মের বক্তা কর্তা এবং রক্ষিতা অংশের সহিত অবতীর্ণ সেই ভগবান জগদীশ্বর কেন করিলেন পরদারাভিমর্ষণ? হে সুব্রত, আপ্তকাম যিনি, সেই যদুপতি—কি অভিপ্রায়ে এই জড়-ঈপ্সিত কর্মের অনুষ্ঠান করিলেন তাহা জানাইয়া আমাদের সংশয় ছেদন করুন।

ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা মহাত্মা শুকদেব কয়েকটি শ্লোকে পরীক্ষিতের এই সন্দেহ নিরসন করিয়াছেন। (১) ঈশ্বরগণের ধর্মব্যতিক্রমের সাহস দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণে বহু উদাহরণ আছে। তেজিয়ানগণের ইহাতে দোষ স্পর্শ ঘটে না।

উদাহরণ-বহ্নি। তিনি যজ্ঞের হবিও গ্রহণ করেন। আবার অমেধ্য পূতি পরীকীর্ণ গলিত শবদেহ দগ্ধ করিতেও ইতস্তত করেন না।

(২) দেহাভিমানী মানব মনেমনেও ঐরূপ আচরণের কল্পনাও করিবে না। দেবাদিদেব মহাদেব সাগর মন্থনোদ্ভূত গরল পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছেন। কিন্তু মানুষ বিষপান করিলে বিনষ্ট হইবে, অপিচ আত্মহত্যার পাপভাগী হইবে (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করিবেন, ইতরেও তাহা অনুসরণ করিবেন, গীতায় ইহা ঈশ্বরের বাক্য হইলেও এ নীতি সর্বত্র প্রযোজ্য নহে।)

(৩) ঈশ্বরগণের বাক্যই সত্য, তাঁহাদের আচরণ কচিৎ অনুসরণীয়। (পূর্বে দেখাইলাম বচনও সর্বত্র গ্রহণীয় নহে) তাঁহাদের বচন ও আচরণে ঐক্য থাকিলে সাধারণে তাহাই গ্রহণ করিবে।

(৪) মহারাজ, অহংবোধ শূন্য ঈশ্বরগণের সদাচরণ ইহ-পরলোকে কোন সুফল প্রদান করে না। তাহাদের অসদাচরণেও কোন অনর্থ উদ্ভূত হয় না।

(৫) অহং বর্জিত ঈশ্বরগণেরই যদি অর্থ এবং অনর্থের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকে, তবে কি করিয়া বলিব যে, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, দেবতাদির নিয়ন্তা এবং কর্মফলদাতা পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের আচরণে কুশল অকুশলের সম্পর্ক আছে?

(৬) যাঁহার পাদপঙ্কজ-পরাগ-পরিসেবিত মুনিগণ যদৃচ্ছ আচরণেও যোগ প্রভাবে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না, সেই শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করিবে কোন্ কর্মের বন্ধন?

(৭) যিনি গোপীদিগের, তাঁহাদের পতিগণের এবং অন্য সমস্ত দেহধারী জীবগণের আন্তর্যামীরূপে বিরাজমান, সেই বুদ্ধ্যাদি—সাক্ষী অধ্যক্ষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লীলার জন্যই দেহ ধারণ করিয়াছেন।

(৮) ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ-পরায়ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নরবপু গ্রহণ পূর্বক এমন মধুর লীলা করেন, যাহা শুনিয়া মানুষ ভগবৎ পরায়ণ হইয়া উঠেন।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং স্থলে ভূতানাং পাঠও দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ বিষয়ী মুমুক্ষু, মুক্তাদি সর্বভূতের প্রতি অনুগ্রহ পরবশ শ্রীভগবানের লীলা কথা মানুষকে ভগবদনুরক্ত করে।

(৯) যোগমায়া কর্তৃক মোহিত গোপগণ আপন আপন পত্নীগণকে স্ব পার্শ্বস্থ মনে করিয়া কৃষ্ণের প্রতি কোনরূপ অসূয়া প্রকাশ করেন নাই।

পরীক্ষিতের প্রশ্নে পরমহংস শিরোমণি শুকদেব নয়টি শ্লোকে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। গভীরার্থ দ্যোতক এই সমস্ত শ্লোকের ব্যঞ্জনা বুঝিবার সামর্থ্য আমার নেই। আচার্যগণের চরণানুসরণে মাত্র ইহাই জানিয়াছি একটির পর একটি শ্লোকে সোপানের পর সোপান অতিক্রম পূর্বক শুকদেব সপ্তম এবং অষ্টম

শ্লোকে ভক্তগণের অন্তরকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। এক একটি শ্লোক অধিকারী ভেদে এক এক শ্রেণীর শ্রোতৃগণকে উদ্দেশ করিয়া উচ্চারিত হইয়াছে। দুরবগাহ শ্রীকৃষ্ণলীলা, দুরবগাহ তাহার ব্যাখ্যান্। দুর্বিজ্ঞেয় মহানুভবগণের চরিত্র। মহৎ ব্যক্তিগণ যেমন আচরণ করিবেন, ইতরেরও তাহা অনুসরণ করা কর্তব্য, গীতার এই মহাবাণীর আক্ষরিক অর্থও আমাদিগকে নিরাপদ করিতে পারিতেছে না। এক্ষেত্রে সমাধান,—মহতের বাক্য ও আচরণ মিলাইয়া আমাদিগকে পথ প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে, পথে চলিতে হইবে। কিন্তু গোপীগণের কুলধর্ম, সংসার, সমাজ, স্বজন ও লজ্জা ধৈর্য পরিহার পূর্বক যে সত্যানুসন্ধিৎসা এবং সত্য সাক্ষাৎকার— পূর্ণ ব্রহ্মসনাতন শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্যই, কৃষ্ণ সেবন, এই আখ্যান শ্রবণ যে পুণ্যপ্রদ, পঞ্চম পুরুষার্থ লাভের এই দিব্য বার্তা যে মানবের একমাত্র শ্রবণ কীর্তন ও অনুধ্যানের বস্তু সে বিষয়ে তো কোন সন্দেহ নাই। গোপী পদাঙ্ককে অনুসরণই মানবের চরম ও পরম সাধন, শ্রীরাধার প্রেমই যে সাধ্য-শিরোমণি, ইহা জানাই তো মানবের এক অভাবনীয় সৌভাগ্যের কথা। পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি বৈয়াসকি উচ্চকণ্ঠে এই দেশ কাথাতীত সত্যই কীর্তন করিয়াছিলেন।

কিন্তু যাঁহার বচনও সত্য, আচরণও সত্য, যিনি আপনি আচরণ পূর্বক জীবকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সত্যের সন্ধান দান করিয়াছিলেন, তাঁহার দিব্যাবির্ভাবের পুণ্য তিথিতে, একটি উপাখ্যানের মাধ্যমে সেই উদাহরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি। শ্রীচৈতন্য চরণানুচর নামসিদ্ধ ব্রহ্মহরিদাসের কথা সর্বজন পরিচিত। আকৈশোর যবনাঙ্কে প্রতিপালিত এই পরম বৈষ্ণব কোন প্রায়শ্চিত্ত করেন নাই। অন্য কোনরূপও তাঁহার সংস্কার সাধিত হয় নাই। তথাপি পাঁচশত বৎসর পূর্বে শান্তিপুরের মত ব্রাহ্মণ প্রধান স্থানে সদাচার নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ আচার্য অদ্বৈত আপন পিতৃশ্রাদ্ধ দিনে এই হরিদাসকেই শ্রাদ্ধপাত্র নিবেদন করিয়াছিলেন। আপন চরিত্র গৌরবে এই মহাত্মা বহুজনের বন্দ্যনীয় পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। তিনদিন রাঢ়দেশ ভ্রমণের পর শ্রীপাদ নিত্যানন্দ তাহাকে আনিয়াছেন শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে। নবদ্বীপের অধিবাসীগণ আসিয়াছেন, আসিয়াছেন শ্রীশচীদেবী। দশদিন আচার্য গৃহে অবস্থানের পর তিনি জননী ও ভক্তগণের অনুমতি লইয়া জননীর আদেশে নীলাচল যাত্রা করিবেন। কাতর কণ্ঠে হরিদাস নিবেদন করিলেন—

নীলাচলে যাবে তুমি মোর কোন্ গতি।
নীলাচলে যাইতে মোর নাহিক শকতি।

মুঞি অধম না পাইয়া তোমা দরশন।
কিমতে ধরিব এই পাপিষ্ঠ জীবন।

এক কঠিন সমস্যা। যদিও হরিদাস তদানীন্তন কুলীন গ্রাম, সপ্তগ্রাম ও শান্তিপুরবাসীর সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র। তথাপি মহাপ্রভু সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী। বিশেষতঃ যাইতেছেন সর্বভারতের অন্যতম আরাধ্য তীর্থ নীলাচলে, পুরুষোত্তমে। সেখানে আসিবেন উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সারা ভারতের নরনারী। নানা শ্রেণীর নানা মতের লোক সব। সকলেই দৃষ্টি রাখিবেন তাঁহার উপর। তাঁহার ভক্তগণের মধ্যেও বহু সমাজের বহু বিচিত্র ব্যক্তির সমাবেশ। ক্ষণেক চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন—হরিদাস, দৈন্য সম্বরণ কর। তোমার দৈন্য আমাকে ব্যথিত করিতেছে। আমি জগন্নাথের নিকট প্রার্থনা জানাইব, এবং আমি তোমাকে শ্রীপুরুষোত্তমে লইয়া যাইব।

মহাপ্রভু নীলাচল হইতে অল্পদিন মধ্যেই দাক্ষিণাত্য পর্যটনে বাহির হইয়াছিলেন। নীলাচলে ফিরিয়াছেন-এই সংবাদ লইয়া দাক্ষিণাত্য সঙ্গী কালা কৃষ্ণদাস নবদ্বীপে আসিলেন। জননী শচী দেবীকে সংবাদ ও শ্রীজগন্নাথ দেবের প্রসাদ দিয়া তিনি অদ্বৈত ভবনে উপস্থিত হইলেন।

সংবাদ শুনিয়া বৈষ্ণব সকলেই পরম উল্লসিত হইয়া উঠিলেন। অতঃপর রথযাত্রার শুভদিন নিকটবর্তী জানিয়া শচীদেবীর আজ্ঞা গ্রহণান্তর আচার্য অদ্বৈতের নেতৃত্বে শ্রীশিবানন্দ সেনের তত্ত্বাবধানে বাঙ্গালার প্রায় দুইশত ভক্ত শ্রীক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রতিটি ভক্ত গিয়া মহাপ্রভুকে প্রণাম নিবেদন করিলেন, মিলনের পর্ব শেষ হইল। মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন হরিদাস কোথায়? একজন গিয়া হরিদাসকে সংবাদ দিলেন, মহাপ্রভু তোমাকে ডাকিতেছেন। হরিদাস বলিলেন—আমি অস্পৃশ্য, আমার মহাপ্রভুর সমীপে যাইবার অধিকার নাই। কোথাও নির্জনে একখানি কুটির পাইলে আমি সেখানেই থাকিব। হরিদাস যেখানে প্রেমানন্দে নাম সঙ্কীর্তন করিতেছিলেন, হরিদাসের অসম্মতির কথা শুনিয়া মহাপ্রভু স্বয়ং গিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন।

প্রভু দেখি পড়ে হরিদাস দণ্ডবৎ হঞা।
প্রভু আলিঙ্গন কৈল তাঁরে যাইঞা॥

দুইজনে প্রেমাবেশে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রভুর গুণে ভৃত্য বিকল, ভৃত্যের আর্তিতে বিহ্বল হইলেন মহাপ্রভু। হরিদাস বলিতে লাগিলেন—নীচ অস্পৃশ্য পামর আমি, আমাকে স্পর্শ করিও না।

প্রভু কহে তোমা স্পর্শী পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম নাহিক আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান॥
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ সন্ন্যাসী হইতে তুমি পরম পাবন॥

কাশী মিশ্রের নির্দিষ্ট পুষ্পোদ্যানে স্থান প্রাপ্ত হইলেন হরিদাস। মহাপ্রভু প্রতিদিন তাঁহাকে দর্শন দান করিতেন। স্বরূপ দামোদর শ্রীপাদ নিত্যানন্দাদিও মহাপ্রভুর সঙ্গে হরিদাসের কুটিরে যাইতেন। মহাপ্রভু প্রতিদিন তাহার নিকট প্রসাদ পাঠাইতেন। হরিদাস কোনদিন শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করেন নাই। মন্দিরের চূড়া দর্শন করিয়াই প্রণাম করিতেন। শ্রীপাদ রূপ ও শ্রীপাদ সনাতন দুইজনে দুইবারে গিয়া প্রায় আট মাস ধরিয়া নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীক্ষেত্রে তাঁহারাও আশ্রয় লইতেন হরিদাসের কুটিরে। হরিদাসের কুটিরেই তাঁহারা মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করিতেন। কত আলাপ-আলোচনা, কত রস-রহস্য, কত ভজন কথা, কত ভগবদ্ লীলা প্রসঙ্গ—কত গূঢ় সাধন সঙ্কেত হরিদাসের শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল—ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

বহুদিন গত হইয়া গেল। প্রতিদিনকার মত মহাপ্রসাদ দিতে আসিয়া মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দ একদিন দেখিলেন, হরিদাস শয়ন করিয়া আছেন—মৃদুস্বরে হরিনাম কীর্তন করিতেছেন। গোবিন্দ বলিলেন—ওঠ, মহাপ্রসাদ গ্রহণ কর। হরিদাস উত্তর দিলেন আজ উপবাস দিব, দৈনন্দিন কৃত্য সমাপ্ত হয় নাই। অথচ মহাপ্রসাদ আনিয়াছ, উপেক্ষা করিব কিরূপে? হরিদাস কণামাত্র গ্রহণ করিলেন মহাপ্রসাদ। গোবিন্দ গিয়া মহাপ্রভুর নিকট হরিদাসের অবস্থা জানাইলেন।

পরদিন মহাপ্রভু হরিদাসের কুটিরে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হরিদাস সুস্থ আছ তো? প্রণাম করিয়া হরিদাস নিবেদন করিলেন—শরীর সুস্থ আছে, মন অসুস্থ। মহাপ্রভু—কেন কি ব্যাধি বল তো দেখি। হরিদাস—সংখ্যা কীর্তন পূর্ণ হইতেছে না। মহাপ্রভু—হরিদাস, সিদ্ধ দেহ তোমার, তথাপি সাধনে আগ্রহ কেন এখনো। লোকানস্তারের জন্ত অবতার তোমার, নামের মহিমা প্রচার করিলে আজীবন। এইবার সংখ্যা কমাইয়া অল্প সংখ্যক নাম কীর্তন কর। হরিদাস বলিলেন, আমার নিবেদন শোন। অস্পৃশ্য অধম আমি, নিন্দ্য দেহ আমার, তোমার দেখিবারও যোগ্য নহে, তথাপি তুমি আমাকে

অঙ্গীকার করিয়াছ। তোমার ক্রীড়া পুত্তল আমি,অনেক তো নাচাইলে আমাকে। ম্লেচ্ছকে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের ভোজ্য, ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধান্নও ভোজন করাইয়াছ। আর কেন, আমি অনুভব করিতেছি, অচিরেই তুমি লীলা সম্বরণ করিবে, সে দৃশ্য যেন আমাকে দেখিতে না হয়। বক্ষে তোমার যুগল পাদপদ্ম ধারণ করিব। নয়নে তোমার চন্দ্রমুখ দর্শন করিব, মুখে উচ্চারণ করিব তোমার শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম। এইভাবে এই মরদেহ ত্যাগ করিতে চাই, যদি তোমার কৃপা হয়, আমার এই ইচ্ছা পূর্ণ কর। মহাপ্রভু বেদনাব্যথিত চিত্তে বলিলেন—তুমি চলিয়া যাইবে, আমি কাহাকে লইয়া থাকিব হরিদাস। হরিদাসের সেই একই উত্তর—ক্ষুদ্র কীট আমি, তোমার লীলার সহায় শত শত মহাজন রহিলেন। এই অধমের অভাবে তোমার কোন ক্ষতি হইবে না। তুমি আর অমত করিও না, কৃপা কর, অনুমতি দাও।

পরদিন সদলে উপস্থিত হইলেন মহাপ্রভু হরিদাসের কুটিরে। আরম্ভ হইল সুধা-সুমধুর শ্রীহরি কীর্তন। নৃত্য আরম্ভ করিলেন শ্রীমান বক্রেশ্বর পণ্ডিত স্বরূপ দামোদর, বাসুদেব সার্বভৌম. রায় রামানন্দ প্রভৃতির সম্মুখে হরিদাসের গুণকীর্তন করিতে লাগিলেন শ্রীমন্ মহাপ্রভু। মহাপ্রভুকে সম্মুখে বসাইয়া মহাপ্রভুর পদদ্বয় বক্ষে ধারণ করিয়া, মহাপ্রভুর বদন কমলে নয়নদ্বয় ন্যস্ত রাখিয়া মুখে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম উচ্চারণ করিতে করিতে হরিদাস ইহধাম ত্যাগ করিলেন। ব্রহ্ম সাযুজ্য তিরস্কৃত জীবন ব্রহ্ম হরিদাস—অবনীর অলঙ্কার মহাপ্রভুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পার্ষদ—যবন হরিদাস।

হরিদাসের শবদেহ কোলে তুলিয়া লইলেন শ্রীমন্ মহাপ্রভু। নৃত্য আরম্ভ করিলেন তিনি কীর্তন মণ্ডলীর মধ্যে। পরে হরিদাসের শবদেহ ভক্তমণ্ডলী বহন করিয়া লইয়া চলিলেন সমুদ্র তীরে। কীর্তনমণ্ডলীর অগ্রে নাচিয়া চলিলেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, তাঁহার পশ্চাতে প্রভৃত প্রিয় বক্রেশ্বর পণ্ডিত।

হরিদাসে সমুদ্র জলে স্নান করাইল।
প্রভু কহে সমুদ্র এই মহাতীর্থ হইল॥
হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদ চন্দন॥
ডোর কড়ার প্রসাদ বস্ত্র অঙ্গে দিল।
বালুকার গর্ত করি তাহে শোয়াইল॥
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্তন।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত করেন আনন্দে নর্তন॥

হরিবোল হরিবোল বলে গৌর রায়।
আপনে শ্রীহস্তে বালু দিলা তার গায়॥

সঙ্গে সঙ্গে সমাধির উপর ইষ্টক বেদী ও তাহার চারিপার্শ্বে বেষ্টনী নির্মিত হইয়া গেল। সমুদ্র স্নানের পর হরিকীর্তন করিতে করিতে মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সিংহদ্বারে আসি প্রভু পসারীর ঠাঞি।
আঁচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিলা তথাই॥
হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসব তরে।
প্রসাদ মাগিয়ে ভিক্ষা দেহত আমারে॥

স্বয়ং মহাপ্রভু ভিক্ষা করিতেছেন, পসারীরা চাঙ্গরা ভর্তি প্রসাদ লইয়া ছুটিয়া আসিলেন। স্বরূপ দামোদর মহাপ্রভুকে গম্ভীরায় পাঠাইয়া নিজে ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। চারিজন বৈষ্ণব একখানি পিছোড়ার চারি কোণে ধরিয়া দাঁড়াইলেন। সকল পসারীর নিকট হইতেই সামান্য সামান্য প্রসাদ সংগৃহীত হইল। ভিক্ষা শেষে ফিরিলেন স্বরূপ। দেখিলেন বাণীনাথ পট্টনায়ক, কাশী মিশ্র প্রভৃতি অনেকেই প্রচুরতর প্রসাদ পাঠাইয়া দিয়াছেন। মহাপ্রভুর নেতৃত্বে হরিদাসের মহোৎসব আশাতীত সাফল্যের সঙ্গেই পরিসমাপ্ত হইল।

গয়াধাম হইতে প্রত্যাগত নিমাই পণ্ডিত শ্রীবাস মন্দিরে যখন বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন পূর্বক বলিয়াছেন—'আমি সেই'। অসঙ্কোচে বয়োজ্যেষ্ঠ পণ্ডিতাগ্রণী সর্বজনবন্দিত আচার্য অদ্বৈতের মস্তকে চরণার্পণ করিয়াছেন। আপন পাদপদ্মে অদ্বৈত প্রদত্ত স-চন্দন তুলসী গ্রহণ করিয়াছেন। আবার সন্ন্যাস গ্রহণের পর ভক্তভাবে ভাবিত মহাপ্রভু শ্রীরূপ রচিত স্বীয় বন্দনা শ্লোক শুনিয়া অতিস্তুতি বলিয়া লজ্জিত হইয়াছেন। পুরীধামে অদ্বৈত কর্তৃক বিরচিত আপন গুনকীর্তন শুনিয়া সকলকে তিরস্কার করিয়াছেন। যখন যেরূপ ভাবাবেশে থাকিতেন, তাঁহার আচরণ ছিল তদনুরূপ। মহাপ্রভুর জীবনে এমন বহু উদাহরণ আছে।

মহাপুরুষগণের চরিত্র আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী চরিত্র। পূর্বাপর আলোচনা পূর্বক দেশকালের পটভূমিকায় বিশেষ অনুধাবনে তাহার সামঞ্জস্য সাধন করিতে হয়, মর্মোদ্ঘাটন করিতে হয়। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর জীবন বহু জটিল তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দিব্যজীবনের ক্রমবিকাশেরও একটি মহত্তম প্রবাহ আছে। শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আলোচনা করিলেই তাহার স্বরূপ উপলব্ধ হয়। সে কথা আমি অন্যত্র বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমার মনে হয় হরিদাস নির্বাণ—মহাপ্রভুর জীবনে বচন ও

আচরণের ঐক্যবদ্ধ একটি সুসম্পূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থল। মহাপ্রভু যে বলিয়াছিলেন — দ্বিজন্যাসী হইতেও তুমি ভুবন পাবন। হরিদাসের মহাপ্রয়াণে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত মহাপ্রভুর আচরণের দিব্য উদাহরণে প্রতিফলিত সেই সত্য আমাদিগকে ধন্য করিয়াছে। এই দুর্দিনে অন্ততঃ বাংলার নরনারী যদি ঐ মহদৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, দেশ হইতে দুর্নীতি অপসারিত হয়। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়, নরনারীর জীবন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, দেশ পবিত্র ও সমৃদ্ধ হয়।

পদ্মাবতী এবং চিন্তামণি

সেকালে জীবনী লেখার প্রথা ছিল না। ছিল আখ্যান এবং উপাখ্যান। ইহারই মধ্যে ব্যক্তিজীবনের দুই একটা ঘটনার চিত্র থাকিত, এবং তাহার মধ্যেই মানুষের সমগ্র জীবন প্রতিভাত হইত। পুরাণে এই প্রথাই অনুসৃত হইয়াছে। পুরাণের মধ্যে দেশের ভৌগোলিক পরিচয় আছে, ইতিহাসের সূত্র আছে। রাজার কথা, প্রজার কথা, জাতির কথা, ব্যক্তির কথা এবং সেকালের নানান জীবজন্তুর কথা আছে। পুরাণ না পড়িলে ভারতবর্ষকে চেনা যায় না, জানা যায় না।

মহাকাব্যের গড়ন কিন্তু অন্যরূপ। ভারতের তিনটি মহাকাব্য—রামায়ণ মহাভারত এবং শ্রীমদ্ ভাগবত। রামায়ণ পাঠ করিবে, তাহার পূর্বে কবিকে জানিতে হইবে। মহর্ষি বাল্মীকিকে না জানিলে রামায়ণ বুঝিতে পারিবে না। রামায়ণের উৎস হইল শোকগাথা—'মা নিষাদ' শ্লোক। ব্যাধ নিক্ষিপ্ত শরাঘাতে ক্রৌঞ্চী নিহত হইয়াছে, তাহাকে ঘিরিয়া ক্রৌঞ্চের আর্ত বিলাপ কবি হৃদয়কে বেদনাতুর করিয়াছে, ইহারই মধ্যে রামায়ণের বীজ নিহিত আছে। এই শ্লোকের অর্থ বুঝিলেই বাল্মীকিকে চিনিতে পারিবে, আর বাল্মীকিকে চিনিলেই রামায়ণের অর্থ উপলব্ধ হইবে।

মহর্ষির তপোবনেই জননী জানকী নির্বাসিতা হইয়াছিলেন। সীতা নির্বাসনের সাক্ষী তিনি। কবি রামায়ণ রচনা করিয়া জানকী তনয় যুগলকেই গান করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন অযোধ্যার রাজসভায় তিনিই লব-কুশকে লইয়া আসিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের যজ্ঞক্ষেত্রে কবিই আনিয়াছিলেন জননী জনক-নন্দিনীকে। তাঁহারই সম্মুখে ধরণী তনয়া পাতালতলে চিরপ্রস্থান করিয়াছিলেন। রামায়ণ পাঠের পূর্বে 'মা নিষাদ শ্লোক পাঠ করিয়াছিলেন। এইবার আবার একবার পাঠ কর কবিস্বষ্ট অবশ্যম্ভাবীনিয়তি-নিয়মের উদ্দেশ মা নিষাদ প্রতিষ্ঠা ত্বং……

॥ ২ ॥

মহাভারত পাঠ করিবে। এবার কিন্তু ক্রমটা অন্যরূপ। মহাভারতের কবি অত্যাশ্চর্য কৌশলে নিজেকে অন্তরালে রাখিয়াছেন। বিশালবুদ্ধি ব্যাসদেব মহাকাব্য রচয়িতা না মহানাটকের নাট্যকার বুঝিতে পারি না। এবার কাব্য পড়িয়া কবিকে নয়, কবি বর্ণিত পুরুষোত্তমকে—মহাভারতের সূত্রধারকে চিনিতে হইবে। আর তাহার জন্যে সমগ্র মহাভারত নয়, মহাভারতের সার শ্রীমদ্ ভগবদগীতা পাঠ করিলেই চলিবে। গীতার আলোকেই শ্রীকৃষ্ণকে জানিতে হইবে। জানিতে পারিবে যেখানে শ্রীকৃষ্ণ সেইখানেই ধর্ম। আর শুনিতে পাইবে সেই চিরন্তন। সত্যবাণী 'যথা ধর্ম তথা জয়'।

॥ ৩ ॥

শ্রীমদভাগবত পাঠ করিবে। এবার কিন্তু পৃথক অধিষ্ঠানভূমি। তোমাকে সেখানে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে। আবার কিন্তু কবি নয়, কাব্যও নয়, এবার তোমাকে ভাগবতের বক্তা ও শ্রোতার সঙ্গে পরিচিত হইতে হইবে। চাহিয়া দেখ—ভারতের সর্বজনবরেণ্যা পূণ্যতোয়া পতিত পাবনী সুরধনী তীরে মহতী সমাবেশ সাধারণে অসাধারণে মিলিত এক বিশাল মহাসভা। এই সভায় বক্তা আকুমার ব্রহ্মচারি মায়ামুক্ত সুপণ্ডিত এবং সুরসিক যুবক বেদব্যাস-তনয় সর্বজন পূজ্য মহাঋষি শ্রীশুকদেব। আর শ্রোতা নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন ভারত সম্রাট বিষ্ণুরাত পরীক্ষিত। সপ্তদিন মধ্যে মৃত্যু অবধারিত জানিয়া যিনি প্রিয়তমা মহিষী, প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র, অগণিত অনুরক্ত প্রজাপুঞ্জ এবং সাগরাম্বরা সাম্রাজ্য পরিত্যাগপূর্বক গঙ্গাতীরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এই স্থান ও কালের কথা স্মরণপূর্বক বক্তা ও শ্রোতাকে চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া তোমাকে শ্রীমদভাগবত পাঠ করিতে হইবে।

॥ ৪ ॥

আমি কাব্য পড়িয়া কবিকে জানাই। সেদিনের একটি কাহিনী বলিতেছি। শান্ত বসাস্পদ পল্লী কেন্দুবিল্বের অজয়-তীরবর্তী কুঞ্জকুটীর। কুটীরে বাস করেন কবিদম্পতি। শ্রীজয়দেব ও শ্রীমতী পদ্মাবতী। কুটীরের অদূরে মন্দির, মন্দিরে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন শ্রীরাধামাধবের যুগল বিগ্রহ। মন্দির মার্জন, কুসুম চয়ন, এবং শ্রীবিগ্রহ যুগলের জন্য ভোগাদি রন্ধন করেন কবিপত্নী পদ্মাবতী। প্রতি প্রভাতে গঙ্গাস্নানান্তে কুটীরে ফিরিয়া স্বহস্তে বিগ্রহ যুগলের পূজার্চনা করেন কবি জয়দেব। দেবোদ্দেশে ভোগ নিবেদন ও প্রসাদ গ্রহণান্তে কবি নিত্য করেন গ্রন্থরচনা, শ্রীরাধামাধবের দিব্যলীলাগীতি শ্রীগীতগোবিন্দ। দম্পতী জীবনের

অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থে লীলায়িত হয় ছন্দে শ্লোকে। অপরূপ স্বয়ং রূপায়িত হন কবিতায়।

মানিনী শ্রীরাধার মানভঞ্জন বর্ণনা করিতে হইবে গ্রন্থে। মানিনীর পদোপ্রান্তে আপতিত হইয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ এই চিত্র অঙ্কন করিতে হইবে। লেখনী কিন্তু অগ্রসর হয় না। পুরন্দরাদি ত্রিবিষদবৃন্দ পরম আদরে যাহার পদারবিন্দে প্রণত হইলে, যাঁহার চরণকমলের কিঞ্জল্কদ্যুতি লুণ্ঠিত মুকুটের মণিপ্রভাকে ম্লান করিয়া দেয়, সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার পদপ্রান্তে পতিত হইয়াছেন— লিখিতে কেমন কুণ্ঠা জাগিয়াছে মনে। গোবিন্দগীতি স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।

জলে পূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে সিক্তবসনে কুটীরে আসিয়া দেখা দিলেন জয়দেব। নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রইলেন দেবী পদ্মাবতী—'গঙ্গাস্নানে গেলে না।' কবি বলিলেন—না, আজ অজয়েই স্নান সেরে এলাম। আমার সমস্যা মিটেছে। এর পরে যা লিখবো তার আভাস মিলেছে। তোমার কতদূর? পদ্মাবতী উত্তর দিলেন তোমার পূজাহ্নিকের মধ্যেই আমার রন্ধনাদি শেষ হয়ে যাবে।

বিগ্রহের অর্চনা, ভোগ নিবেদন, প্রসাদ গ্রহণ শেষ হইল। অতঃপর শয়ন কক্ষে গিয়া গ্রন্থ লিখিয়া কবি পদ্মাবতীকে প্রসাদ গ্রহণের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। পদ্মাবতী ভোজনে বসিয়াছেন, জয়দেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন— নিত্যকার মত গঙ্গাস্নানান্তে প্রত্যাগত জয়দেব। উভয়েরই বিস্ময়ের সীমা নাই। বিগ্রহের সেবাপূজা হয় নাই অথচ পদ্মাবতী ভোজনে বসিয়াছেন। কবি বিস্মিত ব্যথিত ক্ষুব্ধ! পদ্মাবতীর বিস্ময় এই তো শয়নকক্ষে শয্যায় বিশ্রাম করিতেছেন কবি। তবে কমণ্ডলু হস্তে ইনি কে? কবি প্রশ্ন করেন, পদ্মাবতী উত্তর দেন। শেষে পুঁথি দেখিয়া কবির প্রত্যয় জন্মিল—দেখিলেন্ লেখা রহিয়াছে—'দেহি পদপল্লব মুদারম্'।

কবি দম্পতীর এই জীবনকথা রচনা করিয়াছেন দেশবাসী। শ্রীগীতগোবিন্দের অনুরক্ত ভক্ত পাঠকবৃন্দ। অত বড় একজন সাধক ভক্ত কবি জয়দেব, তিনি শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শনপ্রাপ্ত হইলেন না। এমনকি কোন প্রত্যাদেশ স্বপ্নাদেশ প্রাপ্তিও তাঁহার ঘটিল না। পরমপুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিলেন তাঁহার সহধর্মিনী পদ্মাবতী। কিন্তু তিনিও তাঁহাকে স্বয়ংরূপে দেখিলেন না। দেখিলেন আপনার পরম প্রিয়তম দয়িতস্বরূপে। স্বার্থগন্ধহীন মানব প্রেমই অপ্রাকৃত ভগবদ প্রেমের প্রথম অঙ্কুর, বর্ণ পরিচয়। অকপট দাম্পত্য প্রেম হইতেই কামগন্ধহীন ব্রজ প্রেমের দিব্যানুভূতি লাভের সৌভাগ্য ঘটে। শ্রীগীতগোবিন্দ পাঠ করিয়া দেশবাসী এই গুঢ় রহস্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

পদ্মাবতী পতিরূপেই জগৎপতিকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর কবি জয়দেব পত্নী প্রেমের মধ্যেই ভগবদ প্রেমের আস্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। পত্নীর মাধ্যমেই তাঁহার ভগবদ সাক্ষাৎকারের সৌভাগ্য হইয়াছিল।

বহুদিন পূর্বে আমার সম্পাদিত কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দের ভূমিকায় কবি জীবনের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলাম শ্রীগীতগোবিন্দ পাঠে পরকীয় ভাবের পরিস্ফুট স্বরূপ উপলব্ধ হয় না। নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠে একটি আপন-প্রণয়ী দম্পতির মধুময় চিত্র। সে চিত্র মর্তের নহে। সে চিত্র কবি-জীবনের নিবিড়তর অনুভূতির সুন্দরতম বর্ণবিন্যাসে কবি-কল্পলোকের কান্ত আলোকে সত্য সৌন্দর্যে সদা সমুজ্জ্বল। কবি বিরচিত এই গোবিন্দ সঙ্গীত পড়িতে পড়িতে হৃদয়ে অজয় তীরবর্তী একটি নিরালা নিকুঞ্জের সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব প্রতিভাত হইয়া উঠে। কুঞ্জের অপূর্ব সৌন্দর্যের মাঝে দেখিতে পাই প্রেম-মাতোয়ারা কবি-দম্পতি, জয়দেব ও পদ্মাবতী। অনুরাগ অভিমান বিরহ-মিলনের অপরূপ ঘাত-প্রতিঘাতে দম্পতি জীবন প্রণয়লীলার মধুময় ভঙ্গিমায় নিত্য নবরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতেছে। আর সেই লহরীমালা শ্রীগীতগোবিন্দের ছন্দে শ্লোকে লীলায়িত হইয়া উঠিতেছে। আকার পরিগ্রহ করিতেছে।

কিন্তু পরক্ষণেই চাহিয়া দেখি কোথায় অজয়, এ যে কালিন্দী। পদ্মাবতীর নয়ন-কজ্জলে জল কখন কাল হইয়া গিয়াছে। কেন্দুবিল্ব কোথায়, এ তো বৃন্দাবন। জয়দেব সবরমতীর মধুর কোমল কান্ত পদাবলী এতো নয়। এ যে সেই ভুবনমোহন শ্রবণ মনোরসান সুধা সুমধুর মুরলি নিঃস্বর্ণ। কবি-দম্পতিকে কোথায় হারাইয়া ফেলি। দেখি কুঞ্জে কুঞ্জে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাভিনয়! দেখিতে অশ্রুতে নয়ন ভরিয়া উঠে। দৃষ্টি নিষ্প্রভ হইয়া যায়। মনে হয় মেঘে আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। তমালতরু নিকরে শ্যামায় মান বনভূমি ধীরে ধীরে গাঢ় হইতে গাঢ়তর এক স্নিগ্ধ কৃষ্ণতায় আত্মগোপন করিতেছে। আর সেই সৌগন্ধে ভরা অন্ধকার বনপথে কে যে গাহিয়া ফিরিতেছে।

নন্দ নির্দেশত শ্চলিতযে।
প্রত্যাধ্ব কুঞ্জদ্রুমং।
রাধামাধবয়ো র্জয়ন্তি
যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ॥

॥ ৫ ॥

গ্রন্থ পাঠের পূর্বে বক্তা ও শ্রোতার কথা স্মরণ করিতে হয়। চণ্ডী পাঠের পূর্বেই রাজ্যহারা শ্রোতা নৃপতি সুরথ এবং গুহতাড়িত শ্রোতা সমাধি এবং বক্তা মহর্ষি মেধসের কথা স্মরণ করিতে হইবে। গীতা পাঠের পূর্বে কার্পণ্য দোষাপহত স্বভাব শ্রোতা অর্জুন এবং বক্তা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রোতা ও বক্তা একটি বিশেষ আসনে বসিয়া আছেন। এই জন্য আমি তাহার সাদৃশ্য সন্ধান না করিয়া কবিকে চিনিয়া কাব্য-পরিচিতি গ্রহণের জন্য কবি বিল্বমঙ্গল ও উহার বিরচিত গ্রন্থ কৃষ্ণকর্ণামৃতের কথা আলোচনা করিতেছি। আগে কবিকে জানিয়া কাব্য পাঠ।

॥ ৬ ॥

সম্পন্ন গৃহস্থ ব্রাহ্মণ যুবক বিল্বমঙ্গল বারাঙ্গনা চিন্তামণির রূপমোহে আকৃষ্ট হইয়াছেন। নদীতীরে রম্য প্রাসাদে তাহার বাসভবন নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। পণ্যা রমনী চিন্তামণি পরম আরামেই সেই গৃহে বাস করিতেছেন। পরিচর্যার জন্য সেবিকা আছে, প্রহরী আছে রক্ষণাবেক্ষণে। বিল্বমঙ্গল প্রতিদিন সেই আবাসে আসিয়া চিন্তামণির সঙ্গসুখ উপভোগ করেন। চিন্তামণির অদর্শন তাঁহার পক্ষে মরণান্তিক বেদনাদায়ক।

একদিনের ঘটনা। বিল্বমঙ্গলের পরলোকগত পিতার চিরপ্রয়াণের স্মরণ তিথি—শ্রাদ্ধ দিবস। পিতৃকৃত্য সম্পাদনে কুটুম্বাদি ভোজনে অপরাহ্ন অতীত-প্রায়। অপরাহ্নেই মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। মেঘ গর্জনে ত্রাস্ত প্রাণীকূল যে যেখানে পারে আশ্রয় লইয়াছে। নিকষ কৃষ্ণ নিবিড় মেঘ অমার অন্ধকার গায়ে মাখিয়া দশ দিক ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। বিল্বমঙ্গল অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। বৃষ্টির বিরাম ঘটিল রজনী দ্বিপ্রহরে। তিনি গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।

নদীতীরে আসিয়া দেখিলেন তটিনী কূলপ্লাবী বন্যায় উত্তাল। ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড অবলম্বনে বিল্বমঙ্গল নদীপার হইলেন। অবরুদ্ধ বাসগৃহে গাঢ়নিদ্রায় নিমগ্ন দাসদাসীর সাড়া মিলিল না। যুবক প্রাচীর-গাত্র-বিলম্বিত রজ্জু আকর্ষণে প্রাচীরে উঠিয়া লম্ফ প্রদান করিলেন। পতন শব্দে চমকিয়া উঠিলেন চিন্তামণি; ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। প্রদীপ হস্তে শয়ন প্রকোষ্ঠের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন কর্দমাক্ত ভূমিতে পড়িয়া আছেন চেতনাহীন বিল্বমঙ্গল। দাসীর সাহায্যে গৃহে আনিয়া বহু যত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। কীটা-

স্খলিত পূতিগন্ধময় অমেধ্য অপসারণে পরিস্নাত দেহকে, তাহার সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন করিয়া তুলিলেন। ধীরে ধীরে শুনিলেন বিল্বমঙ্গলের তটিনী উত্তরণ ও প্রাচীর উল্লম্ফনের বিবরণ। গৃহের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন রজ্জু নহে, প্রাচীর গাত্রে বিলম্বিত রহিয়াছে প্রাণহীন এক বিষধর সর্প। নদীতীরে দেখিলেন কাষ্ঠখণ্ড কোথায় ! পড়িয়া আছে ক্লেদাক্ত গলিত শবদেহ।

ক্রুদ্ধা হইয়া উঠিলেন বারাঙ্গনা। সমস্ত কৃত্রিমতার আবরণ ছিন্ন করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল চিরন্তনী এক মমতাময়ী রমণী। ধিক্কারে ধ্বনিত হইল গৃহতল। ছি ছি ছি ছি! একটা ঘৃণিতা বেশ্যার জন্য তুমি জীবন বিসর্জন দিতে বসিয়াছিলে। এ তো ইচ্ছাকৃত আত্মহত্যার নারকীয় প্রয়াস। তুমি না ব্রাহ্মণ! সম্ভ্রান্ত বংশে তোমার জন্ম! রক্ত মাংসে গড়া এই তুচ্ছ নারীদেহ, এই দেহেরও তো এই জঘন্য পরিণাম! ঘৃণ্য এই দেহের লালসায় তুমি কিনা—ছিঃ! এই লালসা যদি ভগবানের জন্য হইত!

কঠোর তিরস্কারে বিল্বমঙ্গল সম্বিত ফিরিয়া পাইলেন। তিনি গৃহত্যাগ করিলেন। এই গৃহত্যাগীই শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত রচনা করিয়াছিলেন। লালসাই তো—এই সুতীব্র লালসাই শ্রীকৃষ্ণকে রসস্বরূপকে একান্ত ক্রয় করিবার একমাত্র মূল্য। কর্ণামৃতের বহু শ্লোকে এই একাগ্র লালসা, অকৃত্রিম কামনার বেদনার চিত্র আছে। শ্রীগীতগোবিন্দের চিত্র মিলনের পরের চিত্র, পাওয়ার পরের প্রার্থনার চিত্র। আর কৃষ্ণকর্ণামৃতের বহু শ্লোকে রহিয়াছে সুতীব্র মিলনাকাঙ্ক্ষার চিত্র। পরম প্রিয়তমকে না পাওয়ার আকুলতার আর্তি। প্রার্থিত প্রেমের সাকার ও সাবয়ব বিগ্রহকে আপনার বাহুবন্ধনে বাঁধিতে হইবে।

সঙ্গীত সাধক শ্রীহরিদাস স্বামী—

শ্রীধাম বৃন্দাবনে যে শ্রীবঙ্কিমবিহারী বিগ্রহবাঁকে বিহারী জিউ সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন—তাঁহার প্রতিষ্ঠাতা ভারত বিখ্যাত সঙ্গীতাচার্য শ্রীহরিদাস স্বামী। নিধুবনের বিশাখাকুণ্ড হইতে তিনি এই শ্রীবিগ্রহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই জ্যোতির্ময় শ্রীবিগ্রহ কিছুক্ষণ ধরিয়া দর্শন করিলে দর্শকের নয়ন ঝলসিয়া যায় দৃষ্টিশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তজ্জন্য দ্বারপথে বার বার শ্রীমূর্তিকে অন্তরাল করিয়া একটি যবনিকা টানিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে যাত্রীদের দর্শনের ধারাবাহিকতার বিচ্ছেদ ঘটে। এই জন্য এই দর্শন 'ঝাঁকি দর্শন' নামে খ্যাত।

হরিদাস স্বামী যে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন সে গ্রামের নাম উহা। গ্রামটি মুলতানের অন্তর্গত। শ্রীধাম বৃন্দাবনের পার্শ্বস্থিত রায়পুর গ্রামের গঙ্গাধর নামক কোন ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করিয়া হরিদাস বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করেন। কিছুদিন পরে পূর্ব জন্মের পুণ্যফলে তিনি কৃষ্ণদত্ত গন্ধর্ব নামক এক সঙ্গীত বিদ্যা সিদ্ধ মহাপুরুষের নিকট নাদবিদ্যা প্রাপ্ত হন। জীবনে তাঁহার বৈরাগ্যোদয় হয়। তিনি এই সময়ই বাঁকেবিহারী জীউকে প্রাপ্ত হন। বিগ্রহ লইয়া হরিদাস বৃন্দাবনের অদূরবর্তী মান সরোবরের কুণ্ডতীরে ভজন করিতে থাকেন। অতঃপর গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীবৃন্দাবনে শুভাগমন করিলে হরিদাসও শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া বাস করেন দিল্লীর ধনকুবের দয়াল দাস ক্ষেত্রী বঙ্কিমবিহারীর শ্রীমন্দির নির্মাণ করিয়া দিলে বঙ্কিমবিহারীর সেবা পূজার সুব্যবস্থা হয়। শুনিতে পাওয়া যায় এই ধনবান ক্ষেত্রী হরিদাসকে কতকগুলি মহামূল্য রত্ন প্রদান করিলে স্বামীজী রত্ন কয়েকটি যমুনায় নিক্ষেপ করেন এবং যমুনার জলতলে কত অমূল্য রত্নরাজী পড়িয়া আছে, তাহা দেখাইয়া দেন। হিন্দী ভাষায় রচিত "সাধারণ সিদ্ধান্ত, এবং 'রসকে পদ' গ্রন্থ দুইখানি স্বামীজীর রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। নিধুবনে বিশাখাকুণ্ডে বঙ্কিমবিহারীজীকে পাইয়াছিলেন বলিয়া হরিদাস স্বামীকে নিধুবনে সমাধিস্থ করা হয়।

সম্রাট আকবরের সভার অন্যতম অলঙ্কার স্বনামধন্য গায়ক তানসেন হরিদাস স্বামীর সঙ্গীত শিষ্য। সম্রাট আকবর যে তানসেনকে লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া যমুনাবক্ষস্থিত নৌকা হইতে স্বামীজীর গান শুনিয়া গিয়াছিলেন, সে বিষয়ে প্রবল জনশ্রুতি আজিও অমর হইয়া রহিয়াছে।

প্রবাদ শুনিয়াছি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ইহারই নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন। আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস এই প্রবাদের মধ্যে সত্য আছে। নরোত্তম ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনে ব্যাকরণ, কাব্য সাধন পদ্ধতি আদি শিক্ষা করিয়াছিলেন, বৈষ্ণবগ্রন্থে সে কথার বর্ণনা পাইয়াছি। কিরূপ নিষ্ঠাপূর্ণ সেবার ফলে নরোত্তম শ্রীলোকনাথের কৃপাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহারও বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায় বৈষ্ণব সাহিত্যে। কিন্তু কোথায় তিনি সঙ্গীতশিক্ষা করিলেন সমগ্র সাহিত্যে ঘুর্ণাক্ষরেও তাহার ইঙ্গিতমাত্র নাই। অথচ এই নরোত্তম ঠাকুরই যে সড়েরহাটি কীর্তনধারার প্রবর্তক নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তি রত্নাকরে এবং নরোত্তম বিলাসে তাহা বিস্তারিত ভাবেই বিবৃত করিয়াছেন। খীর মহোৎসবে বাঙ্গলার জ্ঞানী গুণী, ভক্ত, সাধক, গায়ক, বাদক সাধু বৈষ্ণব প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের সমক্ষে বাদক গৌরাঙ্গ দাস ও দেবীদাস এবং গায়ক শ্রীদাস ও গোকুল দাসকে লইয়া নরোত্তম যে নিরবদ্য সঙ্গীত পরিবেশন করিয়াছিলেন, সমবেত সকলেই সে সঙ্গীতের প্রশংসায় মুক্তকণ্ঠ হইয়াছিলেন। বিশুদ্ধ রাগ-তাল সমন্বিত সেই সঙ্গীত কি ব্যাকরণ শিক্ষার ফল? স্বর-গ্রাম বিশুদ্ধ-তান লয়যুক্ত সঙ্গীত না শিখিয়াই কি কেহ ঐরূপভাবে সর্বজন সমক্ষে সঙ্গীতের আসরে নামিয়া অগণিত জ্ঞানীগুণী সঙ্গীত সাধককে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন?

মহাপুরুষদের বাল্যজীবন—শিক্ষাজীবন অনেকেরই অন্ধকারাচ্ছন্ন। মহাকবি কালিদাসের যোগ্যগুরুর সন্ধান না পাইয়া জনরব তাঁহাকে মূর্খের আসনে বসাইয়াছে। বাসুদেব সার্বভৌমের অসাধারণ প্রতিভার কূলকিনারা না পাইয়া ঐ জনশ্রুতিই তাহাকে নবদ্বীপের অরণ্যে পোড়ামাতলায় লইয়া গিয়াছে। কালিদাস সরস্বতীর কৃপা পাইয়াছিলেন। আর স্বয়ং মহামায়া বাসুদেবকে বর দিয়াছিলেন। এমন কত ঘটনা আছে, তাহার সংখ্যা হয় না। নরোত্তমের সম্বন্ধে সেরূপ কোন জনশ্রুতির প্রচলন নাই। সুতরাং তিনি যে কোন সঙ্গীত বিদ্যাসিদ্ধ গুরুর নিকট শুশ্রূষুরূপে উপস্থিত থাকিয়া অনলস সাধনায় সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বৈষ্ণব নামধেয় কতগুলি মতলবাজ ব্যক্তি কবি শেষের দিকে এমনই অধঃপতিত হইয়াছিলেন যে আপন গুরুর মহিমা প্রচারে জালগ্রন্থ রচনাতেও সঙ্কোচ অনুভব করেন নাই। ঈশান নাগরের নামে প্রচারিত অদ্বৈত প্রকাশ, যদুনন্দনের রচনা বলিয়া কথিত কর্ণানন্দ এবং এই ধরনের আরো কতকগুলি জালগ্রন্থ বৈষ্ণব-সাহিত্যকে কলঙ্কিত করিয়াছে। এই সমস্ত অভিসন্ধিপরায়ণ তথাকথিত

কবিগণ নির্বিচারে অলৌকিক ঘটনার আশ্রয় লইয়াছেন। কোন কোন স্থানে শিষ্য গুরুদেবকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। ইহারা এমনই পাপিষ্ঠ যে নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকর শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজকে আত্মহত্যার পাপে নিক্ষেপ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। আধুনিক গবেষকগণ এই সমস্ত জালগ্রন্থের ঘটনা ও কথিত সময় লইয়া ফর্দের পর ফর্দ পুঁথি লেখেন। আড়ম্বরপূর্ণ ব্যর্থ বিচার বিশ্লেষণের আঙ্গিনায় পাণ্ডিত্যের তাণ্ডবে প্রমত্ত হইয়া উঠেন।

আবার এক জাতীয় কবি অলৌকিক রচনায় এমন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়াছেন যে প্রভুর চর্বিত পান খাওয়াইয়া চারি বৎসরের কুমারীকে গর্ভবতী বলিয়া রটাইয়া দিয়াছেন। ইহারা প্রচ্ছন্ন প্রতিহিংসাপরায়ণ কোন দুষ্ট প্রকৃতির লেখক কিনা বিশেষভাবে অনুসন্ধান আবশ্যক। শ্রীবৃন্দাবন দাস—"চৈতন্য লীলার বেদব্যাস",—যেদিন এই দিব্যবাণী উচ্চারিত হইল অমনি একদল লোক তাঁহাকে বেদব্যাসরূপে প্রতিষ্ঠার জন্য বেদব্যাসের জন্মের সঙ্গে তাঁহার জন্মের কোন রকম মিল খুঁজিতে লাগিলেন। এবং জোড়াতালি দিয়া একটা উদ্ভট গালগল্প খাড়া করিলেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর গৌরাঙ্গশূন্য নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া শ্রীবাস চলিয়া গেলেন। সে সময় তাঁহার অবস্থা খুব স্বচ্ছল ছিল না। এই অবস্থায় ভ্রাতৃকন্যা নারায়ণী যদি পুত্রকে লইয়া ভক্ত বাসুদেব দত্তের সাদর আহ্বানে শ্রীবাসের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তাহাতে কটাক্ষ নিক্ষেপের কারণ কি বুঝিতে পারি না। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের কথোপকথন—যাহা শ্রীবৃন্দাবন দাস চৈতন্য ভাগবতে লিখিয়া গিয়াছেন—আধুনিক গবেষকগণ তাহা হইতে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের বিবাদের সন্ধান পাইয়া থাকেন। ইহা যদি বিবাদমান দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর গালাগালি হইত—নিত্যানন্দ শিষ্য বৃন্দাবন কি তাহা হইলে ঐ গালাগালি লিপিবদ্ধ করিতেন? চৈতন্য ভাগবতে এবং চৈতন্য চরিতামৃতে ঐ সমস্ত বাহ্যত গালাগালি যে নিন্দাচ্ছলে স্তুতি তাহা পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণকে তো গবেষণা করিতে হইবে! আর একটা নূতন কিছু না করিলে গবেষণাই বা হইবে কেন? তাই পণ্ডিতগণ বিজ্ঞের মত গম্ভীর কণ্ঠে ঐ সমস্তকে নিছক গালাগালি ধরিয়া মন্তব্য করিয়া থাকেন।

আমার এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য কোথায় সত্য আছে, কোন কথাটা মিথ্যা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে হইবে। প্রবাদও অনেক সময় সত্যঘটনাকে কেন্দ্র করিয়াই পল্লবিত হইয়া উঠে। অনেক স্থলেই অলীক গালগল্পই কালে প্রবাদে পরিণত হইয়াছে, ইহা অস্বীকার না করিয়াও বলা যায় যে, কার্যকরণ

অনুসন্ধান করিয়া পরিবেশ বিচার করিয়া, পাত্র-পাত্রীর গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া আমরা যদি প্রবাদকে আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ করি,—তাহা হইলেই সত্য মিথ্যা আবিষ্কার সম্ভব হইতে পারে। আমি শ্রীধাম বৃন্দাবনের বহু প্রাচীন বৈষ্ণবের মুখে শুনিয়াছি শ্রীহরিদাস স্বামীর নিকটেই নরোত্তম শ্রীবৃন্দাবনে সংগীত শিক্ষা করিয়াছিলেন। তানসেনের ধারা ধ্রুপদের ধারা। আর নরোত্তমের ধারা ধ্রুপদধর্মী গড়ের হাটি কীর্তনের ধারা। পুণ্যশ্লোক নাদসিদ্ধ হরিদাস স্বামীই এই দুই ধারার মূল উৎস।

শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দ

তত্ত্বের দিক হইতে নহে, সাধারণ ব্যক্তিত্বের দিক প্রসঙ্গটির আলোচনা করিতেছি। প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বের কথা কোথায় বীরভূমি আর কোথায় নবদ্বীপ। বীরভূমির একচক্রায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন শ্রীনিত্যানন্দ। পিতা ধনশালী ছিলেন না। সদাচারী এক ব্রাহ্মণ, দরিদ্রই বলা চলে। হাড়াই পণ্ডিতের যাজকতা ছিল। শ্রীচৈতন্য ভাগবত প্রণেতা শ্রীবৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন বালক নিত্যানন্দ 'কিবা কৃষিক্ষেত্রে আর যজমান ঘরে' সর্বত্রই পিতার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেন। লেখাপড়া শিক্ষার সুযোগ ঘটিল না। এক অজ্ঞাতনামা সন্ন্যাসী আসিয়া আপন সেবার জন্য দ্বাদশ বৎসরের কিশোর নিত্যানন্দকে ভিক্ষা করিয়া লইয়া গেলেন। সত্য রক্ষার জন্য পিতা ও মাতা উভয়েই এক অজ্ঞাত কুলশীল সন্ন্যাসীর হস্তে পুত্রকে দান করিয়া দিলেন।

সন্ন্যাসীর সঙ্গে বালক ফিরিলেন সারা ভারতবর্ষে। কিশোর যুবক হইলেন। ভারতবর্ষের তৎকালীন অবস্থা, লোকচরিত্র অধ্যয়ন করিলেন যুবক। দাক্ষিণাত্য শ্রীপাদ্ মাধবেন্দ্র পুরীর গুরুদেব শ্রীপাদ্ লক্ষীপতি পুরী নিত্যানন্দকে দীক্ষা দান করেন। নিতাই সন্ন্যাস দীক্ষা লইয়া ছিলেন, বৈষ্ণবাবধূতের দীক্ষা। কিন্তু যোগপট গ্রহণ করেন নাই। গিরি, পুরী প্রভৃতি দশনমী সম্প্রদায়িক রীতি অনুসারে যে একখানি বস্ত্রখণ্ড বক্ষে বাঁধিতে হয়, তাহাকেই যোগপট্ট বলে। এক এক সম্প্রদায়ের এই বস্ত্র বাঁধিবার ছাদ পৃথক পৃথক। যোগপট্ট গ্রহণ করেন নাই শ্রীপাদ দামোদর মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ। তাই সকলে তাহাকে বলিতেন স্বরূপ দামোদর। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লেখা আছে—

সন্ন্যাস কৈল শিক্ষা সূত্র ত্যাগরূপ।
যোগপট্ট না লইল নাম হইল স্বরূপ।

শ্রীনিত্যানন্দও স্বরূপ আখ্যায় অভিহিত হইতেন। শ্রীবৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন —নিত্যানন্দ স্বরূপের আজ্ঞা অনুসারে।'

শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতি পুরীর তিরোধানে শোকার্ত চিত্তে শ্রীনিত্যানন্দ উপস্থিত হইলেন শ্রীবৃন্দাবনে। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র সে সময় শ্রীবৃন্দাবনে ছিলেন। মাধবেন্দ্র শ্রীনিত্যানন্দকে জানিতেন, শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতি পুরীর দীক্ষিত শিষ্য বলিয়াই চিনিতেন। যদিও গুরুভ্রাতা, তথাপি শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীমাধবেন্দ্রকে গুরুবুদ্ধিতেই দেখিতেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের আদেশে বা অনুরোধেই শ্রীপাদ নিত্যানন্দ নবদ্বীপে শুভাগমন করেন।

সবে মাত্র শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দিব্য প্রকাশের শুভ সূচনা হইয়াছে নবদ্বীপে। নিত্যানন্দ আসিলেন, শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সঙ্গে মিলন ঘটিল। একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত অবধূত একান্ত অন্তরঙ্গরূপে গৃহীত হইলেন, অধিকার করিলেন শ্রীগৌরাঙ্গের জ্যেষ্ঠ সহোদরের পূজ্য স্থান। শ্রীবাস পণ্ডিত, আচার্য অদ্বৈত প্রভৃতি সকলেই শ্রীনিত্যানন্দের এই অধিকার মানিয়া লইলেন।

শ্রীচৈতন্য ভাগবতে আচার্য অদ্বৈতের সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দের প্রণয় কলহের কথা আছে। আধুনিক গবেষকগণ তাহা হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গের সম্প্রদায়ে অনেকেই নিত্যানন্দকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। ইহারা ভুলিয়া যান যে, শ্রীবৃন্দাবন দাস শ্রীনিত্যানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আচার্য অদ্বৈতের ঐ নিন্দাছলে স্তুতির গভীরার্থমূলক শ্লিষ্ট উক্তিগুলি যদি নিন্দার্হ হইত, তাহা হইলে সেই কথা লিখিয়া শ্রীবৃন্দাবন দাস গুরুনিন্দার পাতক অর্জন করিতেন না। গুরুদ্রোহী শ্রীবৃন্দাবন দাস ইহা চিন্তা করাও মহাপাপ।

শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে নিত্যানন্দের চিন্তাধারার কথঞ্চিৎ পার্থক্য ছিল। উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল একই প্রকার, কিন্তু উদ্দেশ্যসাধনের পথ ছিল কিছু ভিন্ন। শ্রীমহাপ্রভু চাহিতেন মানুষ স্বক্ষেত্রে থাকিয়াই আপন সাধনবলে আত্ম সম্প্রসারণে বিকশিত হইয়া উঠুক, সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত হউক, জীবনের চরম এবং পরম সার্থকতা লাভ করুক। শ্রীনিত্যানন্দ চাহিতেন মানুষকে সমূলে উৎখাত করিয়া লইয়া আসিতে—আপনাদের পুণ্যাবেষ্টনে। একটি সুদৃঢ় গণ্ডীর মধ্যে থাকিলে প্রতিবেশ প্রভাবে তাহার আর পতনের আকাঙ্ক্ষা থাকিবে না। ইহাই ছিল শ্রীনিত্যানন্দের মনের কথা।

মহাপ্রভুর সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল, মানুষের মধ্যে যে মনুষ্যত্ব সুপ্ত আছে, একবার তাহাকে জাগাইয়া দিলে, সে মানবতা বোধ আর বিনষ্ট হইবে না। পথে চলিতে যদি বা এক আধবার পদস্খলন ঘটে, সে আপনিই সাবধান হইবে। সামলাইয়া লইবে। ঠেকিয়া শিখিবে। আশ্চর্য্যের বিষয় মহাপ্রভুর সুপ্ত বিশ্বাসের অপহ্নব ঘটিয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত অন্ততঃ বৈষ্ণব গ্রন্থের মধ্যে নাই। কত সাধারণ মানুষকে তিনি চিহ্নিত করিয়া দিয়াছিলেন। খোলা বেচা শ্রীধর ভিখারী শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী প্রভৃতি তাহার আত্যুজ্জ্বল উদাহরণ।

স্থানচ্যুত করিয়াছিলেন তিনি তিনজনকে। পদগৌরবের উচ্চশিখরে সমাসীন ক্ষমতাশালী রাজবল্লভ শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনকে তিনি পথের ধুলায় নামাইয়া আনিয়াছিলেন। এই দুইজনকে সযত্নে শিক্ষাও দিয়াছিলেন, আবার পরীক্ষাও করিয়া দেখিয়াছিলেন। সপ্তগ্রামের ধনকুবের গোবর্দ্ধন দাসের একমাত্র পুত্র শ্রীরঘুনাথকে তিনি পথের ভিখারীরও নিম্নে নামাইয়া ছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়—ইহাকে তিনি কোনদিন শৃণু বৎস বলিয়া কোন উপদেশ প্রদান করেন নাই। যে প্রশ্ন রঘুনাথের অন্তরে উদিত হইয়াছে, অন্তর্যামী রূপে অন্তরে থাকিয়াই সে প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন মহাপ্রভু। আচরণের পর আচরণ আপনিই অবলম্বন করিয়াছেন রঘুনাথ। নিন্দা ও অনুমোদন পর পর মিলিয়াছে। তিন বৎসর রঘুনাথের ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। পিতার পয়সায় রঘুনাথ প্রসাদ কিনিয়া ভিক্ষাদান করেন, একথাও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। যেদিন রঘুনাথ আপনাআপনি ভিক্ষা বন্ধ করিয়া দিলেন, সেদিন বলিলেন ঠিকই করিয়াছে রঘুনাথ—"বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।"

মানুষকে বিশ্বাস শ্রীপাদ নিত্যানন্দও করিতেন। কিন্তু তাহার সাবধানতা ছিল প্রচুর, সতর্কতা ছিল বিশেষ রূপ। জগাই মাধাইকে স্বক্ষেত্র হইতে উন্মূলিত করিয়া না আনিলে, তাহাদের এইরূপ অপরূপ পরিবর্ত্তনে বিলম্ব ঘটিত। "সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ" এই সঙ্গদোষ নির্মূল করিবার প্রয়োজন ঘটিয়াছিল। সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী বলিয়া মহাপ্রভু আচরণে সদা সতর্ক থাকিতেন। বলিতেন—

শুক্ল বস্ত্রে মসী বিন্দু যৈছে না লুকায়।
সন্ন্যাসীর অল্প দোষ সর্ব্বলোকে গায়।

শ্রীনিত্যানন্দের সে ভীতি ছিল না। এই প্রেমোদ্দাম অবধূতের ছিল না লোকাপেক্ষা। আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে, পতিতোদ্ধার ব্রতে কোন নিয়ম

শৃঙ্খলাই তিনি মানিয়া চলিতেন না। শ্রীগদাধর দাস আদি তাহার অনুচরবৃন্দের জীবনে ইহার উদাহরণ মিলিবে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই জন্যই শ্রীনিত্যানন্দকে বৎসর বৎসর পুরীধামে আসিতে নিষেধ করিতেন। পুরী যাত্রার পথেও শ্রীশিবানন্দ সেনকে তিরস্কারে এবং তজ্জন্য শিবানন্দর ভাগিনেয় শ্রীকান্তের অভিমানে আমরা ইহার পরিচয় পাইয়াছি। আপন সম্প্রদায়ে শ্রীনিত্যানন্দের আচরণ ছিল, সর্ব্বত্রই সম্রাটের মত। সারা বাংলায় তাঁহার করুণা প্লাবনে যে বিপ্লবের সৃষ্টি হইয়াছিল, আমাদের সমাজের মধ্যে তাহার বহু নিদর্শন আজিও দেখতে পাই।

চৌষট্টি মহান্ত, দ্বাদশ গোপাল, তাঁহাদের শিষ্য প্রশিষ্য এবং আপনাদের হঠাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য এবং আপনার অনুরক্ত ভক্তগণকে লইয়া যোজনান্তর সংস্কৃতি কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা—এই পরিকল্পনা প্রধানত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর। চব্বিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ, ছয় বৎসর সারা ভারতবর্ষে পর্যটন এবং আঠার বৎসর শ্রীজগন্নাথ ধামে অবস্থান—ইহাই শ্রীমহাপ্রভুর জীবনের অন্যতম পরিচয়। এই আঠার বৎসরের প্রতি বৎসর বাঙ্গলা হইতে দুই শতাধিক ভক্ত পুরীধামে যাইতেন এবং চাতুর্মাস্য যাপন পূর্ব্বক রথযাত্রা দর্শনান্তে বাঙ্গলায় ফিরিয়া আসিতেন। এই চারিমাস প্রতিদিন কত আলোচনা কত পরামর্শ হইত, কত শিক্ষালাভ হইত শ্রীমহাপ্রভুর আচরণ দেখিয়া। এই পরামর্শাদি বাস্তবে রূপায়িত করিতেন শ্রীপাদ নিত্যানন্দ। সংস্কৃতি কেন্দ্রের ভার লইতেন ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য নবশাখে শ্রেণীর ভক্তগণ। ব্যাকরণ অলঙ্কার জ্যোতিষ আয়ুর্বেদ সঙ্গীত প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রের পঠন পাঠন হইত এই সমস্ত কেন্দ্রে। বসন্তে যেমন কত নাম না জানা ফুলের শোভা ও সৌরভ, কত নাম না জানা পাখীর কলকাকলি সৌন্দর্য ও মাধুর্যের সমারোহ সৃষ্টি করে। শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের দিব্যাবির্ভাব তেমনই বাঙ্গলাকে এক নূতন শোভায় ও সঙ্গীতে নির্মল ও মধুর করিয়া তুলিল। গ্রামে গ্রামে সাধু সজ্জন গায়ক, কবি পণ্ডিতের আবির্ভাব-ধন্য বাঙ্গালী একটা নূতন জাতি রূপে আত্মপ্রকাশ করিল। এই জন্মেই জন্মান্তর লাভে বাঙ্গালী দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইল।

শ্রীনিত্যানন্দ জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরীক্ষা সর্বধর্ম পরিত্যাগের উদাহরণ মহাপ্রভুর অনুরোধে দার পরিগ্রহ। বান্ত্যাশী অপবাদ সহিয়াও তিনি বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রথমা পত্নী বসুধার গর্ভজাত পুত্র শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু সকল দিক দিয়াই পিতার অনুগামী ছিলেন। নিরলসভাবে পিতৃ পদাঙ্ক অনুসরণ

বীরচন্দ্রের জীবনের পরিপূর্ণ আলেখ্য। ঠিক পিতার মতই তিনি মানুষকে সমূলে উৎখাত করিতেন। তৎসাময়িক বৈষ্ণব সমাজের তিনজন সর্বজনমান্য আচার্য বীরচন্দ্র প্রভুকে যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা করিয়া চলিতেন। তাহার পরই জনজীবনে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। দেশে পুনরায় অন্ধকার নামিয়া আসিল। এখন তো রজনী দ্বিপ্রহর। নক্ষত্র পর্যন্ত অদৃশ্য। চতুর্দিকে শিবা দলের অশিব চীৎকার, কুক্কুরের আর্তনাদ, প্রেত তাণ্ডবকে ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে। কোথায় পরিত্রাতা!